Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইজমা তুল ইশা

রোলঃ 228020239

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইজমা তুল ইশা

রোলঃ 228020239

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইজমা তুল ইশা, আইডিঃ 228020239 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ejmatul Esha

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ইজমা তুল ইশা

আইডিঃ 228020239

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা-

হিন্দুত্ববাদের হিংস্র থাবা পড়েছে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ এর উপর।

হিন্দুত্ববাদ (Hindutva)একটি জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদের ভিত্তি ১৯২৩ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের 'হিন্দুত্ব: হু ইজ আ হিন্দু' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুত্ব শব্দটি শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম নয়, বরং একটি জাতীয়তাবাদী আদর্শ যা ভারতবর্ষকে একক হিন্দু জাতি হিসেবে গঠনের প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ, যেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান, সেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই হিন্দুবাদী আগ্রাসনের নানান রূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চুক্তির নামে বিশ্বাসঘাতকতা, সংস্কৃতির নামে আক্বীদাগত আগ্রাসন, মিডিয়ার মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুফরি চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা—এসবই একটি সুপরিকল্পিত তাগুতি ষড়যন্ত্রের অংশ। এই আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ, ইসলামি চিন্তা-চেতনা এবং জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে।বাংলাদেশের মুসলিম এবং মানুষের জীবন আজ বিপন্ন এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এর জন্য।

গত কয়েকদশক ধরে এই হিন্দুত্ববাদীরা শোষণ এবং নির্যাতন চালিয়ে আসছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, তাই এই ব্যাপারে আমাদের সকলের অবগত থাকা উচিত।

এই থিসিসে বাংলাদেশে হিন্দুবাদী আগ্রাসনের ধরণ, তাদের ব্যবহারকৃত কৌশল, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং তার প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজের করণীয় ও প্রতিরোধ কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে সচেতনতা সৃষ্টি করা, উম্মাহর অন্তরে ঈমানি তেজ ফিরিয়ে আনা, বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করা, এবং আল্লাহর দ্বীনকে এই ভূমিতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

হিন্দুত্ববাদের ধারণা,উৎস ও আদর্শিক ভিত্তি:

"হিন্দু জাতীয়তাবাদ" একটি মতবাদ। এই মতবাদটি ১৯২৩ সালে বিনায়ক দামোদ সাভারকার রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন।

হিন্দুত্ববাদ শব্দটি প্রথমে বাংলা সাহিত্যিক ও লেখক উপেন্দ্রনাথ হাওসু উনবিং শতকে ব্যবহার করেছিলেন এবং পরে বাল গঙ্গাধর তিলক এটি ব্যবহার করেন। তা ওই সময় এই শব্দটি কেবল ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সংস্কৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এ বিপরীতে সাভারকর এই শব্দটিকে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন

করেছিলেন:

“সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো হিন্দুপন, অর্থাৎ কে কতটা হিন্দু। এবং যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই মতবাদে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা বিবেচনা করা হলে এর অর্থ হতে পারে- কে কতটা হিন্দুস্তানি।

সাভারকারের মতে হিন্দুত্ববাদের তিনটি ভিত্তি রয়েছে:

এক. রাষ্ট্র (সমন্বিত সমাজ)

দুই. জাতি (সমন্বিত জাতি-গোষ্ঠী)

তিন. সংস্কৃতি (সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি)

এই তিনটি ভিত্তিকে সামনে রেখে সাভারকার "হিন্দু" শব্দের একটি নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, যা হিন্দুত্ববাদের ধারণার ভিত্তি তৈরি করে। সাভারকারের মতে:

"হিন্দু" বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার জন্য সিন্ধু নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষের ভূমি কেবলমাত্র তার পিতৃভূমি নয়, একইসঙ্গে তার পবিত্র ভূমি। অর্থাৎ, সেই ভূমি যেখানে তার ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে।"

হিন্দুত্ববাদী মতবাদ অনুসারে, স্থানীয় ধর্মগুলো যেমন হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং শিখধর্ম জাতীয়, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক মিল রয়েছে। এ কারণে তারা জাতি, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের দিক থেকেও একত্রিত। এদের সবাইকে "হিন্দু" বা ভারতীয় গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে, সেমেটিক ধর্মগুলো বা আব্রাহামিক ধর্মগুলো (ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম) বাইরের দেশ থেকে এসেছে, এদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভিন্ন, এবং এই ভূখণ্ড তাদের ধর্মের জন্মভূমি নয়। সেজন্য এগুলোকে ভারতীয় ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

এইভাবে এই তত্ত্বের অনুসারীরা ভারতের নাগরিকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: এক. সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুস্তানি হলো সেই ব্যক্তি, যিনি হিন্দু ধর্মের অনুসারী।

দুই, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয় হলো সেই ব্যক্তি, যিনি হিন্দুধর্মের পরিবর্তে অন্যান্য স্থানীয় ধর্ম যেমন জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখ ধর্ম ইত্যাদির অনুসারী।

তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম, খ্রিস্টান বা অন্যান্য বহিরাগত ধর্মের অনুসারী, সে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না এবং তাকে ভারতীয় বলা উচিত নয়।

হিন্দুত্ববাদের চিন্তাবিদদের মতে, যারা সেমিটিক ধর্মাবলম্বী এবং যাদের জাতি ও রাষ্ট্র ভারতীয়, তারা যদি দুটি শর্ত পূর্ণ করেন, তবে তাদের প্রকৃত ভারতীয় বলা যেতে পারে:
এক. তারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ ভারতীয় রীতিনীতি, প্রথা ও উৎসবগুলোকে গ্রহণ করবেন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে ফেলবেন।

দুই. এই ভূমিকে তাদের পবিত্র স্থানগুলোর চেয়ে বেশি পবিত্র বলে মনে করবেন।
উদ্দেশ্যসমূহ
এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করার মূল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণীতে ব্যাপকভাবে বিভক্ত, ফলে তাদের মধে ঐক্যের অভাব রয়েছে, যার ফলে অন্যান্য ধর্ম ও জাতি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদের শাসন করে। সুতরাং, একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান করবে, যা একদিকে হিন্দু ঐক্য (হিন্দু সংগঠন) প্রচার করবে এবং একই সাথে একটি এমন পরিচয় তৈরি করবে, যার মাধ্যমে "হিন্দু" শব্দ শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে সীমাবদ্ধ না থেকে, ভারতের অন্যান্য স্থানীয় ধর্মসমূহ, যেমন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং শিখধর্ম প্রভৃতি, তাদেরও হিন্দু বলা হবে। বরং এক্ষেত্রে আরও এগিয়ে গিয়ে এই স্থানীয় ধর্মগুলোকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসেবেও পরিচিত করা হবে, যাতে তারা বিদেশি ধর্ম এবং জাতির তুলনায় বেশি রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে এবং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

লক্ষ্যসমূহ:

হিন্দুত্ববাদের নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক লক্ষ্য রয়েছে:
এক. হিন্দুদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়, শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী করা হবে।
দুই, হিন্দু পরিচয়ের ক্ষেত্রে পুরো উপমহাদেশে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যা এই পরিচয়টিকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।
তিন, এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যার মাধ্যমে সেই সকল ব্যক্তিদের পুরনো ধর্মে ফিরে আসবে, যারা বহিরাগত ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

৩-হিন্দুত্ববাদ বনাম হিন্দুধর্ম: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষন

হিন্দুধর্ম এক সনাতন ধর্ম। এটি ভারত ও নেপালের প্রধান ধর্ম। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আরও কিছু স্থানের মানুষও হিন্দুধর্ম চর্চা করে থাকে। সারা পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা ১২৫ কোটি কি তারও বেশি। ওদিকে হিন্দুত্ববাদ শব্দটির উৎপত্তি হিন্দু থেকে হলেও হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ববাদের মধ্যে মৌলিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য রয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা, প্রয়োগ ও পরিণতির দিক দিয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ববাদ একে অপরের বিরোধী। হিন্দুধর্মের উৎপত্তি আড়াই হাজার বছরেরও আগের। এই সনাতন ধর্ম অন্তর্নিহিত অর্থ, ব্যঞ্জনা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে আর দশটি ধর্মের মতোই একটি ধর্ম। হিন্দুধর্মের মূল কথা পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা পদক্ষেপ হিসেবে আত্মার বিশুদ্ধতা অর্জন এবং সেটা ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম বা সৎ কাজের দ্বারা অর্জিত হতে পারে। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করতে হলে বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র ও শ্লোকে বিশ্বাস করতে হয়। তাই বলে ধর্মীয় আচার মানা না মানার ব্যাপারে কঠোর বাধ্যবাধকতা নেই।
এর জাতিভেদ প্রথা তথা জাতপাতের অভিশপ্ত ব্যাপারটা ছাড়া ক্ষতিকর দিক তেমন নেই।

অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদ কথাটা প্রথম প্রয়োগ করেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা ও হিন্দু স্বার্থের প্রবক্তা বিনায়ক দামোদার সাভারকার। সাভারকার হিন্দুদের হিন্দু হিসেবে গ্রহন করার পরিবর্তে তাদের একটি জাতি হিসেবে দেখেছেন।এবং হিন্দুত্ববাদকে হিন্দু ধর্মের অংশ বলে অভিহিত না করে, বরং হিন্দু ধর্মকে হিন্দুত্ববাদের একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
'হিন্দুত্ববাদ' শব্দটা ভারতের সর্ববৃহৎ হিন্দু জাতীয়তাবাদী জোট 'সংঘ পরিবার' ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো জনপ্রিয় করে তুলেছে। সংঘ পরিবার হিন্দুত্ববাদ শব্দটা ব্যাপক অর্থে বুঝিয়ে ব্যবহার করে থাকে, যার মধ্যে দেশজভাবে ভারতীয় এমন সবকিছুই অন্তর্গত এবং প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সীমান্তের বাইরে থেকে আগত অন্যান্য ধর্ম ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর যা কিছু আমদানি হয়েছে ধর্মসহ, সে সবকিছুই পরিত্যাজ্য।

হিন্দুধর্ম একটা ধর্মীয় বিশ্বাসমাত্র। এটি একটি জীবনধারা এবং অরাজনৈতিক। অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে এর কোন সম্পৃক্ততা নেই। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদ শব্দের অর্থ, ব্যঞ্জনা ও গুরুত্ব অধিকতর রাজনৈতিক। 'সংঘ পরিবারের' মতো গোঁড়া হিন্দু রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ছত্রছায়ায় সংগঠনগুলো হিন্দুত্ববাদকে অতি শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। অসংখ্য অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে এই সংঘ পরিবার এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় যেখানে হিন্দুদের একাধিপত্য থাকবে।

হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল। অন্যদিকে যে হিন্দু নয় বা হিন্দুদের আধিপত্য মেনে নেয় না, তার কোন স্থান হিন্দুত্ববাদে নেই। হিন্দুধর্ম চরিত্রগতভাবে গণতান্ত্রিক এবং এমন এক বহুদলীয় ও বৈচিত্র্যময় সমাজের সমার্থক, যা অন্যান্য গোষ্ঠীর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদ মনোলিথিক সমাজে বিশ্বাসী, যেখানে হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার, প্রথা ও ঐতিহ্যের বাইরে অন্য কিছু থাকবে না।

হিন্দুধর্মের অনেক শাখা-প্রশাখা এবং অনেক সনাতনী ধর্মীয় আচার আছে। এই ধর্মের বিভিন্ন জাত-পাতের লোকেরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা আর্চনা করে। সব ধরনের দেবদেবীই হিন্দুধর্মে পূজিত। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদ এই বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী হলেও রামচন্দ্রকেই হিন্দুত্বের আইকন হিসেবে তুলে ধরে।

হিন্দুধর্ম এক অরাজনৈতিক জীবনধারা। এর কোন সংগঠন নেই, কাঠামো নেই, প্রাতিষ্ঠানিক গঠনতন্ত্র নেই। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের এক জটিল মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী মতবাদ। এটা ধর্মও নয়, আবার জীবনধারাও নয়। এটা এক সাম্প্রতিক ও আগ্রাসী রাজনৈতিক দর্শন যার, মধ্যে জিঙ্গোইজম বা উগ্র স্বদেশপ্রেম, উৎকট জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় সত্তা জটিলভাবে মিশে আছে। হিন্দুত্ববাদ জাতীয়তাবাদকে একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস ও আনুগত্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

কংগ্রেস দলীয় এমপি শশী থারুর সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন- 'হোয়াই আই এ্যাম এ হিন্দু।' তাতে তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্ম নিজেকে একমাত্র সত্য বা প্রকৃত ধর্ম বলে দাবি করে না। হিন্দুধর্ম জোর দিয়ে বলে যে বিশ্বাসের সমস্ত পথই সমান বৈধ। থারুরের মতে, অন্যদিকে সংঘ পরিবারের বিশ্বাস হিন্দুত্ব এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে ভারত প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের ভূমি। তার পরিচয় ও সত্তা একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতীয় জীবনের সারবস্তু। তাই সংঘে পরিবারের দাবি অনুযায়ী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ভারতের ইতিহাস এই প্রাচীন ভূমির মালিক ও রক্ষক হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বৈরী বিদেশী হানাদারদের আঘাত থেকে রক্ষা করার সংগ্রামের ইতিহাস। সংঘ পরিবার আরও বলে যে ভারতে অহিন্দুরাও আছে, তবে তারা হানাদার। ভারতের প্রতি তাদের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে তাদের সহ্য করা যেতে পারে, তবে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করলে তাদের হিন্দুদের সমান বলে গণ্য করা যেতে পারে না। সে কারণে হিন্দু ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য বলে সংঘ পরিবার মনে করে। বিশ্বাস করে যে, হিন্দুরা আর সবার বিরুদ্ধে। থারুরের মতে, সংঘ পরিবারের এই মতবাদের দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত বাস্তবতা অস্বীকার করা হয়।

থারুর বলেন, নিজে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হিসেবে তিনি হিন্দুত্ববাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বরং হিন্দু ধর্মের নামে তারা যা করছে বলে দাবি করে তার জন্য তিনি লজ্জিতবোধ না করে পারেন না। তাদের কর্মকা-ের পরিণতিতে যে সহিংসতা হচ্ছে সেটা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক।

হিন্দুত্ববাদীরা বেদ, উপনিষদকে তুচ্ছ গোঁড়ামি রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করেছে। গুন্ডামি, অসহিষ্ণুতা, জাত্যাভিমানী তা-বের উপশম বানিয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে।

গোহত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা গোরাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলমানরা গোহত্যা করে আইন ভঙ্গ করছে, এই অজুহাতে তাদের নির্যাতন ও হত্যা করার একটা মওকা ছাড়াও আর কিছু নয়। নাগারকার আরও লিখেছেন যে গোরাজনীতির সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিকটা হলো, এটা ধর্মীয় গ্রন্থাবলী, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীদের অজ্ঞতার আরেক দৃষ্টান্ত। যেমন, গোহত্যা ভারতের অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, এ কথা বেদে বর্ণিত আছে। কিন্তু বেদের এই বক্তব্যে হিন্দুত্ববাদীদের কিছুই যায় আসে না।

প্রতাপ এ্যান্টনি সোশ্যাল সায়েন্সেস ম্যাগাজিনে 'হিন্দুত্ব ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম হিন্দুইজম' শিরোনামে এক নিবন্ধে লিখেছেন, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ববাদ দুটো আলাদা বিষয়। হিন্দুত্ববাদ হলো মৌলবাদ। হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘৃণা, বিভক্তি ও অ-আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ। ভারতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর হামলা, সহিংসতা ও ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি এসব কার্যকলাপের জন্য দায়ী হলো হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদ। এটা ফ্যাসিবাদেরই বহির্প্রকাশ, যা ভারতে আজ চলছে। সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS) ও সংশ্লিষ্ট হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহ:

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)-

১৯২৩ সালে সাভারকরের লিখা "হিন্দুত্বভা" বই প্রকাশিত হয় এবং এটি পড়ে হেডগেওয়ার নামক এক লোক প্রভাবিত হন এবং ১৯২৫ সালে তিনি RSS প্রতিষ্ঠা করেন।এবং তিমি মারাঠা সাম্রাজ্যের পতাকা এবং ভাগওয়া ধ্বজ(গেরুয়া রং এর পতাকা) কে RSS এর প্রতীক এবং পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।এটি হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের সবচেয়ে বড় সংগঠন এবং কর্মীদের দিক দিয়েও এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংগঠন। বর্তমানে সারা বিশ্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দু রাষ্ট্রের মতো স্লোগানগুলোর পতাকা এই সংগঠনই ধারণ করেছে।ভারতে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে "গেরুয়া সন্ত্রাস এবং গণপিটুনির ঘটনা সমূহ এই সংগঠনের কর্মীদের দ্বারাই সংগঠিত হয়।এছাড়াও ভারতীয় পতাকা এবং সংবিধান এর বিরোধিতাও এই সংগঠনটি করে।তাছাড়া ১৯৪৮ সালের গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসেও আরএসএস সদস্য ছিলেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি

-১৯৮০ সালে বিজেপির উত্থান এর মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক উত্থান ঘটে, এটি RSS এর রাজনৈতিক শাখা।রাজনৈতিক কর্মীর দিক দিয়ে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল।এরা হিন্দু জনগনের মধ্যে জাতি এবং শ্রেনী বিভেদকে কাজে লাগিয়ে সবাইকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্ববাদের ধারণায় একত্রিত করেছে।তাছাড়া এদের জনপ্রিয়তার আরেকটি বড় কারণ হলো এরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দিয়েছে।এর ফলস্বরূপ ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদে আক্রমণ চালিয়ে তা ধংস করে এবং প্রায় ২ হাজার মানুষকে হত্যা করে যার মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম।২০০২ সালে নরেন্দ্রমোদী গুজরাটে হাজার হাজার মুসলিম পরিবার ধংসের মাধ্যমে হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে।এর ফলস্বরূপ তারা ২০১৪ এবং ২০১৯ এর নির্বাচনে সফলতা লাভ করে।২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ বিজয় হিন্দুত্ববাদের মূলধারায় প্রবেশের একটি বড় দৃষ্টান্ত। এই সময় থেকে হিন্দুত্ববাদ কেবল রাজনৈতিক আদর্শ নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে রূপ নেয়। গোরক্ষা, লাভ জিহাদ, নাগরিকত্ব আইন (CAA), এবং কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ—এসব পদক্ষেপ হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দুত্ববাদী একটি চরমপন্থী এবং আক্রমনাত্মক সংগঠন। এরা বৌদ্ধ, জিন শিখ এবং স্থানীয় আদিবাসী ধর্মগুলোকে হিন্দু সম্প্রাদায়ের অংশ হিসেবে মনে করে।এটি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু মন্দিরের নির্মান ও উন্নয়ন,এমন মসজিদ বা উপাসনালয় চিহ্নিত করা যেখানে আগে মন্দির ছিলো এবং সেখানে আবার মন্দির নির্মানের

আন্দোলন করা।এবং গরু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।তাছাড়া যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহন করেছে তাদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা।

বজরং দল-

এটি বিশ্বহিন্দু পরিষদ এর যুবশাখা।এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিলো-অনেকক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর উষ্কানিমূলক ভাষনের কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ছিলো এবং দাঙ্গার সৃষ্টি হচ্ছিল, তাই নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তারা এই শাখাটি তৈরী করে,কিন্ত পরবর্তী তে দেখা যায় এই শাখার কাজ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করা।এছাড়া **১৯৯২** সালে বাবরি মসজিদের ধংসে এরা ভূমিকা পালন করে। এবং ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় মুসলিম হত্যা এবং মুসলিমনারীদের সম্ভ্রমহানি এবং মুসলিমদের সম্পত্তি এরা লুট করে।২০১৫ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল “গোরক্ষা” (গরু হত্যা প্রতিরোধ) নামে আন্দোলন শুরু করে,যেখানে গরু হত্যার অভিযোগে মুসলিমদের নিয়মিত দলবদ্ধভাবে হত্যা করে।এছাড়াও ২০২২ সালে এরা হালাল মাংস বিক্রেতাদের বাড়ি গিয়ে আক্রমণ করে।এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিভিন্ন মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ায়।

৫- দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দুত্ববাদের সম্প্রসারণ কৌশল:

হিন্দুত্ববাদ শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতবাদ নয়, বরং এটি এখন একটি আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক কৌশলে রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো—বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান—এই সম্প্রসারণ নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই দক্ষিণ এশিয়ার অনঞ্চলগুলোকে একত্র করে “অখন্ড ভারত” নামে একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র তৈরী করা। যার মাধ্যমে তারা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক সীমান্তকে পুনরুদ্ধার করতে চায়।

এছাড়াও তাদের হিন্দুত্বাবাদী যে উদ্দেশ্য গুলো তা পূরণ করতে চায় এই অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১-হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে একটি "ধর্ম-ভিত্তিক সভ্যতা" গড়ে তোলা।
২-বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মকেও "হিন্দুধর্মের অংশ" হিসেবে দেখিয়ে এই ধর্মগুলোর স্বাতন্ত্র্য হ্রাস করার প্রয়াস।

৩-মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ‘বহিরাগত’ এবং ‘অহিন্দু’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সংস্কৃতিকে সীমিত করা।

৪-প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে ভারতের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছত্রছায়ায় আনয়ন করা।
৫-নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি রাষ্ট্রে ভারতপন্থী সরকারকে সমর্থন দিয়ে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

৬-ভারতীয় টেলিভিশন, সিনেমা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ও পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে **ভারতীয়-হিন্দু সংস্কৃতি** চাপিয়ে দেওয়া।
৭-ইতিহাসের হিন্দুকেন্দ্রিক পুনর্লিখনের মাধ্যমে মুসলিম শাসন ও উপমহাদেশের বহুত্ববাদী ইতিহাসকে অস্বীকার করা।
৮-ভারতীয় সেনাবাহিনী ও গোপন সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি বা 'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান'-এর নামে হস্তক্ষেপ।

সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব (যেমন: বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত, নেপাল-ভারত মানচিত্র বিরোধ) সৃষ্টি করে প্রতিবেশীদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা।
আরএসএস এবং এর সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলো যদিও এদের হিন্দুত্ববাদী আদর্শকে জাতীয়তাবাদ হিসেবে তুলে ধরে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তা ভারতীয়দের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই। এই সংঘ পরিবার এদের অখণ্ড ভারত বা অবিভক্ত ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে ধারণা, সেটিই প্রচার করে থাকে। এ ধারণায় এরা আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার, নেপাল ও তিব্বত থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত একটি একক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে।

৬-বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে "ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের উত্থান

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এমন একটি স্থানে অবস্থিত, যেখান থেকে 'ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চলের দেশসমূহে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ফলে বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। 'ইন্দো-প্যাসিফিক' (ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে যে দেশগুলি রয়েছে) অঞ্চলে প্রায় তিনশ কোটি মানুষের বাজার। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ চায় আমেরিকা, চীন, ভারতের মতো শক্তিগুলি।১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বে আমরা পূর্ব পাকিস্তান হলেও ভারত সবসময়ই চেয়েছে বাংলাদেশ তাদের সাথে যুক্ত থাকুক,এরফলস্বরুপ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করলেও তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো পশ্চিম পাকিস্তান বা পাকিস্তান এর মতো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করে নিজেদের কবলে নেওয়া। এবং অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।
বড় প্রমাণ '৭১-এ ভারত নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে মুজিবনগরের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের সাথে গোপনীয় অসম ৭ দফা চুক্তি করতে বাধ্য করেছিল। এ চুক্তি ৭ দফা চুক্তি নামে খ্যাত।

চুক্তির শর্তসমূহ :

দফা-১ : যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য পদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

দফা-২ : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কিন্তু কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনঃ নিরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দফা-৩ : বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

দফা-৪ : অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

দফা-৫ : সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কতব দিবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

দফা-৬ : দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (open merket) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হবে বছর ভিত্তিক এবং যার পাওনা সেটা স্টালিংয়ে পরিশোধ করা হবে।

দফা-৭ : বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দিবে।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উক্ত সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধ শেষে মিত্রবাহিনী প্রায় ৬০ হাযার কোটি টাকার মালামাল এবং মিল-কারখানার যন্ত্রপাতি লুট করে সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী শিশু রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে পরনির্ভরশীল করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিযোদ্ধাদের করার কিছুই ছিল না।

ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র বলা হলেও ভারত আমাদের এই ছোট্র বাংলাদেশে চালাচ্ছে হিন্দুত্বাবাদী আগ্রাসন এবং একচেটিয়া মাস্তানি। তারা মূলত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র।কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্ব তাদের মননে ভরপুর। যেমন:বাংলাদেশের সীমান্ত হত্যা,করিডোর সুবিধা নেওয়া,পানি আগ্রাসন এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইত্যাদি।

এছাড়াও তাদের যেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলো তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন তৈরী করা,হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা তৈরী করা,এবং এই বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোতে।

স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের প্রাণপ্রিয় এ দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের সম্মানিত শাসকবর্গ বারবার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের সাথেই হাত মিলিয়ে বেশ উদারতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। তিনি বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না’ *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

৭- সীমান্ত হত্যা, বিএসএফ ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব

বিএসএফ এর সীমান্ত হত্যা-

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী(বিএসএফ) এক বর্বর এবং জঙ্গি গোষ্ঠীর নাম,যারা প্রতিনিয়ত পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে বাংলাদেশিদের, শুধু হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়না,এর সাথে যুক্ত আছে তাদের অপহরণ এবং মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তারা বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে বাংলাদেশ এর সম্পদ নিয়ে যায়।

'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী একুশ শতকের প্রথম দশকে বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছে সহস্রাধিক বাংলাদেশী। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) **২০১৫** সালের জানুয়ারি থেকে **২০২৫** সালের মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ সময়ে দেশের বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে নিহত হয়েছেন **৩১৩** বাংলাদেশি। আহত হয়েছেন অন্তত ৩৩০ জন।এছাড়াও মানবাধিকার সংস্থা অধিকার দেওয়া তথ্যমতে বিএসএফ ২০০০-২০২০ সাল অবধি

বিএসএফ হত্যা করে -**১২৩৬** জনকে,আহত করে **১১৪৫** জনকে ,অপহরণ করে **১৪০৮** জনকে,ধর্ষন করে **১৫** জনকে,গুম করে **১১১** জনকে।

২০১১ সালের কুড়িগ্রাম এর কিশোরি ফেলানিকে মেরে তারা কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রেখেছে ঘন্টার পর ঘন্টা।২০১৮ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সীমান্ত সম্মেলনে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেয় ভারত,সে প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি।বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হত্যা যেন থামছেই নাহ,অথচ বিচার হয়নি একটির ও।

সমুদ্রসীমায় আধিপত্য:

আমাদের সমুদ্র সীমা অমিমাংসিত বলে তারা আমাদের সীমানার ভিতরে ঢুকে তাদের সীমা বলে দাবি করছে। (এটি মিয়ানমার ও করছে) যদি তাদের ইচ্ছা পুরন হয় তাহলে তিন বিঘা করিডোরের মত বাংলাদেশেরও কয়েক বিঘা করিডোর লাগবে বহিঃসমুদ্রে যাবার জন্য। একেই বলে দাদাগিরি।

আমাদের ইলিশ না হলে তাদের পূজা-পার্বন হয় না। তাই তারা সমুদ্র থেকেই আমাদের ইলিশ নিয়ে নিচ্ছে। তারা অবাধে আমাদের সীমান্তে প্রবেশ করে মাছ ধরছে। আবার আমাদের জেলেদের কাছ থেকে চোরাই পথে সমুদ্র থেকেই কিনে নিচ্ছে। তাছাড়া স্থল পথে চোরাই কারবার আছেই। কিন্তু এর বিপরীতে তারা আমাদের দিচ্ছে ইয়াবা, ফেনসিডিল। তাদের দেশের সীমান্ত ঘেষে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ফেনসিডিল কারখানা শুধু বাংলাদেশে পাচার

করার জন্য। এগুলো নিয়ে বিএসএফ এর কোন মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথা গরু চুরি নিয়ে। তাই আমাদের মেরে ফেলতেও তাদের কোন বাঁধে না।

সমুদ্র সন্ত্রাসে যুক্ত হয়েছে তাদের জেলেদের অত্যাচার। আগে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ ধরতে আসতো। এখন আধুনিক ট্রলারে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা প্রায় জোর করে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় এসে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রলারগুলোতে যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকায় তারা একে অপরের সাথে সহজেই অতি দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে। ফলে এক মিনিটেই তাদের সব জড় হয়ে যায়। যদি বাংলাদেশের জেলেরা তাদের কাজে প্রতিবাদ করে তাহলে আমাদের গরীব নিজেদেরকেই দুর্ভাগ্য বরন করে নিতে হয়। তারা দ্রুত যোগাযোগ করে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের জেলেদেরই ধাওয়া করে। অনেক সময় জাল আর নৌকাও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এর উপর রয়েছে তাদের আধুনিক মাছ ধরার জাল। এই জালগুলো মাইলের পর মাইল বিস্তৃত থাকে। বাংলাদেশের সীমান্তে তারা ১০০-১৫০ ট্রলার নিয়ে প্রবেশ করে। এই ভাবে মাইলের পর মাইল জাল বিছিয়ে টেনে মাছ ধরলে বাংলাদেশে সমুদ্রে কয়েকদিন পর মাছ বলে কিছু থাকবে না।

কাটাতারের বেড়া : ভারত একতরফাভাবে সীমান্তে কাটাতারের বেড়া নির্মাণ করে যাচ্ছে। এটি করতে তারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানোর কথা তারা বেশী বলছে। অথচ তাদের দেশের মানুষও দেদারসে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। অনেক ক্ষেত্রে কাটাতারের বেড়া নোম্যান্সল্যান্ডের মধ্যে করা হচ্ছে। আবার বাংলাদেশ সীমান্তের ১০, ১৫, ৩০ ফুট ভিতরে ঢুকেও বেড়া নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশইন:

ভারতের অবৈধ "পুশ-ইন" (Push-in) নীতি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে একটি গুরুতর মানবাধিকার ও কূটনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) যাদেরকে তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে, জোরপূর্বক বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়, অনেক সময় কোনো পূর্ব সতর্কতা বা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই। *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, ৪ থেকে ৭ মে বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা দিয়ে ভারত থেকে ১৬৭ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩ জনকে খাগড়াছড়ি, ৪৬ জনকে কুড়িগ্রাম, ২৩ জনকে সিলেট, ১৫ জনকে মৌলভীবাজার, ১০ জনকে চুয়াডাঙ্গায় পুশ ইন করা হয়।

এক দেশের কোনো নাগরিক আরেক দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ করলে তাঁকে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনকানুন অনুসরণ করে ফেরত পাঠাতে হয়। কিন্তু ভারত যেভাবে কোনো ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে এই মানুষগুলোকে বাংলাদেশে পুশ ইন করল, তা সম্পূর্ণ বেআইনি, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী

এই পুশইন এর সাথে ভারতের হিন্দুত্ববাদের বড় সম্পর্ক রয়েছে,২০১৯ সালে আসামে যে এনআরসির তালিকা তৈরি হয়েছে, তার কোনোটাই সারা ভারতের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু

বিজেপির নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর কিংবা সুস্পষ্টভাবে বললে 'সংঘ পরিবারের' অ্যাজেন্ডা হচ্ছে এনআরসির নামে ভারতকে এক হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হবে। পাঁচ বছর ধরে বিজেপির বিভিন্ন কার্যকলাপেই তা সুস্পষ্ট। এখন একদিকে বিজেপি আসামের এনআরসি বাতিলের দাবি করছে, অন্যদিকে ভারতের সব রাজ্যে এনআরসি করার হুজুগ তুলেছে। কারণ, বিজেপির আশা ছিল এবং এভাবেই প্রচার চালিয়েছিল যে আসামের এনআরসি যাদের নাগরিক নয় বলে শনাক্ত করবে তাদের অধিকাংশ হবে মুসলিম—তাদের সহজেই বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করা যাবে।

৮-অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও বাণিজ্য বৈষম্য

ভারতীয় এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন বানিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে,ইতিমধ্যে ট্রানজিটের নামে ভারত করিডোর সুবিধা নিয়েছে।বাংলাদেশ সরকার ভারতকে স্থলপথ এবং রেলপথ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে,পাশাপাশি মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের অনুমতিও পেয়েছে ভারত।কিন্ত ২০২৫ সালে সরকার পরিবর্তন এর হুট করে ভারত বাংলাদেশের জন্য ট্রানজিট সুবিধা প্রত্যাহার করে, যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি লজিস্টিক্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।এছাড়াও ভারত বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে আমদানির উপর ৪২% সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, যার ফলে $৭৭০ মিলিয়ন মূল্যের পণ্য প্রভাবিত হয়েছে।

তাছাড়া বিগত দুই দশকে দুই দেশের শাসকদলের সম্পর্কের গভীরতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়েছে। যার মূল দর্শন ছিল ভারতের আর্থিক ও বাণিজ্যিক লাভবান হওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশের একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাকে টিকে রাখা। আর এ কারণেই বাংলাদেশ-ভারত অর্থ ও বাণিজ্য সম্পর্কে এখন গুরুতর টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সংস্থার সাম্প্রতিক সব হিসাব-নিকাশে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারত থেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পণ্য আমদানি হয়, যা মোট আমদানির ১৮ শতাংশ। ভারত থেকে যত অর্থমূল্যের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ রপ্তানি করে তার ৭ ভাগের মাত্র ১ অংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের আমদানি বিল পরিশোধের পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে ভারত থেকে ৪৭৪ কোটি (৪.৭৪ বিলিয়ন) ডলারের বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেছিল বাংলাদেশ।এর পরের ১০ বছরে আমদানি গুণিতক হারে বেড়েই চলেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসে ভারত থেকে আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৩৬৯ কোটি (১৩.৬৯ বিলিয়ন) ডলারে। তবে ডলার সংকটের কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরায় বাংলাদেশের

সার্বিক আমদানি ১৬ শতাংশের মতো কমেছিল।২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯৯ কোটি ডলারের পণ্য ভারতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ।অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতে ২১৩ কোটি (২.১৩ বিলিয়ন) ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়, যা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি।

ভারত ২০২৩ অর্থবছরে কমপক্ষে ৩০ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স আয় করেছে বাংলাদেশ থেকে। মূলত পোশাক শিল্পের মার্চেন্ডাইজিং, ফ্যাশন ডিজাইনিং ও ক্রেতা হ্যান্ডলিং খাত থেকে বেশি রেমিটেন্স নেয় ভারতীয়রা, যার ৮০ শতাংশই কোনো ধরনের কর-ট্যাক্স দেয় না।

এক সময় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের অহঙ্কার ছিল এসকিউ, ক্রিস্টাল, মাস্টার্ড, হলিউড, শান্তা, রোজ, ফরচুনা, ট্রাস্ট, শাহরিয়ার, স্টারলি ও ইউনিয়ন অ্যাজাক্স সহ উন্নত মানের কারখানা। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য তারা আজ বাংলাদেশের কারখানা নেই। নানা ছলে বলে কৌশলে এগুলো কিনে নিয়েছে ভারতের কেম্পানিগুলো। এতে সহযোগীতা করেছে এদেশে কাজ করতে আসা ভারতীয় কর্মকর্তারা। তারা কৌশলে শ্রমিক অসন্তোষ লাগিয়ে এই কারখানাগুলো লোকসানে নিয়ে গিয়েছে। তারপর উদ্ধারের নামে কিনে নিয়েছে।

এছাড়াও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাবে বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে বাংলাদেশে ৫ লাখ ভারতীয় নাগরিক অবস্থান করছেন।

আবার কোনো সংস্থার মতে এই সংখ্যা ২৬ লাখ। কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের হিসাবে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয়দের সংখ্যা ১ লাখ ৭ হাজার ১৬৭ জন। এদের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ ভিসায় রয়েছেন ১০৪৮৫ জন, চাকরি ১৪৩৯৯ জন, স্টাডি ৬৮২৭ জন এবং ট্যুরিস্ট ভিসায় ৭৫ হাজার ৪৫৬ জন। ভারতীয়দের বাংলাদেশে বৈধভাবে চাকরি করার সুযোগ দেওয়া হলেও বাংলাদেশীদের সে দেশে চাকরির কোনো সুযোগ নেই।

https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/bangladesh-india-trade-relations

৮- ভারতীয় নদীশাসন ও কৃত্রিম বন্যা:

একটি ভৌগোলিক আগ্রাসন

সর্ব প্রকারে মুসলমানদের ঐক্য ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে কাজ করাই হিন্দুত্ববাদী ভারত এর লক্ষ্য। মাফিয়াতান্ত্রিক স্বৈরশাসন চালিয়ে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বের মুখে ঠেলে দেয়ার মূল অনুঘটক যেমন ভারত, তেমনি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় কোটি কোটি মানুষের অশেষ দুর্ভোগের পেছনেও ভারতের আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসী পানি নীতি দায়ী।

ভারত আন্তর্জাতিক পানি হিস্যার নীতিমালা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে বাংলাদেশে প্রবাহিত ৫৪ টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।অর্থাৎ ফিডার ক্যানেল দিয়ে সেদেশের অভ্যন্তরে অন্য নদীতে পানি সরিয়ে নিচ্ছে,ফলে বাংলাদেশ দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।প্রথমত শুকনো মৌসুমে পানি পাচ্ছেনা, অন্যদিকে বন্যার মৌসুমে অন্যায়ভাবে বাধঁগুলো খুলে দিয়ে এদেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এতে নদীভাঙ্গন তো বাড়ছেই সাথে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হচ্ছে এবং ফসল নষ্ট হচ্ছে।

ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের সময় আন্তর্জাতিক একটি গণমাধ্যমে এই সংশয় প্রকাশিত হয়েছিল যে, ভারত বাঁধ নির্মান করছে বটে, পাকিস্তান এটি বাস্তবায়ন করতে দিবে কি না। দ্বিখ-িত পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ সে সুযোগ এনে দিয়েছিল। ৪০ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালুর কথা বলে ফারাক্কা প্রজেক্ট চালু করে আর কখনোই বন্ধ করেনি।

একতরফাভাবে ফারাক্কা ব্যারাজ চালুর ৭ বছরের মাথায় গজলডোবা (তিস্তা) ব্যারাজ দিয়ে ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে তিস্তার পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ডাইভারশন ক্যানেলের মাধ্যমে মহানন্দা নদীতে পানি সরিয়ে নেয়ার কারণে তিস্তা এখন একটি মৃতপ্রায় নদীতে পরিণত হয়েছে। গজলডোবা বাঁধের আগে তিস্তা অববাহিকায় যেখানে ২৫০০ কিউসেক পানি পাওয়া যেত, সেখানে ভারতের পানি প্রত্যাহারের কারণে এখন পানি প্রবাহের পরিমাণ ৪০০ কিউসেকেরও কম। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে তিস্তা ব্যারাজ নির্মাণের পরিকল্পনা ব্রিটিশ আমল থেকে বিবেচনাধীন থাকলেও অবশেষে ১৯৭৯ সালে তিস্তা ব্যারাজ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ তা শেষ করে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও গজলডোবা ব্যারাজ এবং ভারতের পানি প্রত্যাহারের কারণে দেশের অন্যতম বৃহৎ এই সেচ প্রকল্প এখন আংশিকভাবে অকেজো হয়ে আছে।

দুই দেশের অভিন্ন নদীর পানি বন্টনও সমস্যা সমাধান কল্পে ১৯৭২ সালে জেআরসি বা যৌথ নদী কমিশন গঠিত হলেও এটি মূলত ভারতের স্বেচ্ছাধীন একটি কমিশন হিসেবে কাজ করছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছরে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও ২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত একযুগে একটি জেআরসি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশের আহ্বানে তারা সাড়া দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

একযুগ নিরবতার পর ২০২২ সালে শেখ হাসিনার ভারত সফরের আগে যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয় মূলত বাংলাদেশের ফেনি নদী থেকে ত্রিপুরার সাবরুম শহরের জন্য পানি নেয়ার চুক্তিতে সই করাতে। দশকের পর দশক ধরে তিস্তার পানি চুক্তির মূলা ঝুলিয়ে অভিন্ন ৫৪টি নদীতে বেআইনীভাবে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে শুষ্ক মওসুমে পানি বঞ্চিত করলেও নিজেদের প্রয়োজনীয়তা কিংবা দরকষাকষির না করেই বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ফেনী নদী থেকে পানি দিতে শেখ হাসিনা বশংবদ ভূমিকা পালন করেছেন। এমন অসম পানি ও বন্দর চুক্তির সমালোচনা করে ফেইসবুকে একটি পোস্ট দেয়ার কারণে ২০১৯ সালে বুয়েটের মেধাবি শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন।

ভারতের এই পানি আগ্রাসন এর কারণে প্রতিবছরই বন্যায় বাংলাদেশ এর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়,সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখতে পাই যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বাংলাদেশ সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান যে, দেশে সাম্প্রতিক বন্যায় ১১ জেলায় মোট ১৪ হাজার ২৬৯ কোটি ৬৮ লাখ ৩৩ হাজার ৫২২ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উপদেষ্টা আরও জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ৯ লাখ ৪২ হাজার ৮১১ জন। মৃত্যের সংখ্যা ৭৪ জন। আহত হয়েছেন ৬৮ জন। মৃতদের অনেকেই সর্পদংশনে মারা গিয়েছে।

তো এটা বলাবাহুল্য যে ভারতের এই আগ্রাসন এবং কৃত্রিম বন্যা বাংলাদেশ এর জন্য বিরাট ক্ষতি বয়ে আনছে বছরের পর বছর।

৯- ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ”র” এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ

১৯৬২ সালে ভারত-চীন এবং ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সেই গোয়েন্দা তথ্যের ঘাটতি থেকে একটি নতুন গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ‘র’। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) নামে তৈরি এই সংস্থার ওপর দায়িত্ব পড়ে বিদেশি সরকার, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের তথ্য সংগ্রহ করার।

বাংলাদেশে “র” এর আগ্রাসন শুধু বর্তমান সময়ে নাহ,বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্মের আগ থেকেই তাদের আগ্রাসন চলছে।এবং আমাদের অভ্যন্তরীন রাজনীতে তারা আগ্রাসন চালাচ্ছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধেও ছিলো “র” এর তৎপরতা, তারা চেয়েছিলো বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে ভারতের সাম্রাজ্য কায়েম করা অথবা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা।

এবং তাদের আরেকটা মূল লক্ষ্য ছিলো যেভাবেই হোক পাকিস্তানকে আলাদা করা,কারণ ২ পাশে ২ টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রেখে তাদের সার্বভৌমত্বে হুমকির মুখে রাখা তারা চায়নি।

গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে এদেশে 'র' এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ব্যাপক। তবে মূল উদ্দেশ্য হলো- ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য পশ্চিম বাংলা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত 'সেভেন সিস্টার' খ্যাত পার্বত্য রাজ্যগুলোর মাঝে অবস্থিত বাংলাদেশকে ভারতের প্রভাব বলয়ে রাখা, যাতে সেখানে ভারত বৈরী কোন শক্তির সাথে এমন কোন সম্পর্ক গড়ে না উঠে, যা এ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য বিস্তারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারত সবসময় 'বন্ধুভাবাপন্ন' বাংলাদেশের বললেও আসলে তাদের 'বন্ধুভাবাপন্ন' কথাটি হচ্ছে বাংলাদেশ এমন পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি গ্রহণ করুক, যা ভারতের নীতি আদর্শের সমান্তরাল। এমনটি হলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে রাখার পরিপূরক। ভারত যে বাংলাদেশের গৃহীত আদর্শকে তাদের পক্ষে দেখলেই কেবলমাত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার দৃষ্টান্ত **১৯৭১** সালেল শেষ দিকে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে ভারতীয় পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা জেনে খুশি হবেন, বাংলাদেশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষমতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-কে তাদের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে'। এ চার নীতি ছিল ভারতীয় সংবিধানে অনুসৃত নীতির অনুরূপ। ভারত শুরু থেকে চেয়েছে যে, বাংলাদেশ তাদের পক্ষে থাকুক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হোক ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অনুকূল। এজন্য তাদের প্রয়োজন একটি 'বন্ধুপ্রতিম' বাংলাদেশ সরকার এবং অনুরূপ একটি সরকার গঠন বা ভারতের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণে চাপ প্রয়োগের দায়িত্ব হচ্ছে 'র'-এর।

এছাড়াও "র" এর আওতাধীন একটি বাহিনী ছিলো "মুজিব বাহিনী" যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও তারা বাংলাদেশ এর মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করতে চাইতো।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান অবধি "র" আধিপত্য বিস্তার করছে,

আবু রুশদ বাংলাদেশে ভারতের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান 'র' কর্মপরিধি ও অনুপ্রবেশের মাত্রা বাংলাদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এসব সাক্ষাৎকারেও উঠে এসেছে যে, ভারতের অপতৎপরতার সামনে বাংলাদেশ কতটা অসহায়। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা বা এনএসআই-এর সাবেক এক মহাপরিচালক ব্রি: জে: (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম এর মতে, বাংলাদেশে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে 'র' হাত বাড়ায়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সেক্টর ছাড়াও সামরিক এমনকি ধর্মীয় পর্যায়েও 'র' থাবা বিস্তার করেছে।

বেশ কয়েকবছর আগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র' নিয়ে আমাদের দেশে একটি বই বেরিয়েছিলো। বইটির মাধ্যমে না জানা অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সেসময় জানা

গিয়েছিল।বইটির নাম ‘বাংলাদেশে র’। এর লেখকের নাম সাবেক সেনাসদস্য ও সাবেক ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক লে. (অব) আবু রুশদ।এই বইটিতে লেখক এমন অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে নতুন করে জাতি চিন্তার খোরাক (পঙ্গু দুশ্চিন্তার খোরাক) পায়। ওনার দেয়া সেই চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলো আজ আবার জাতির মাঝে আলোচিত হয়ে ঘুরে-ফিরে আসছে। তাই সেই চাঞ্চল্যকর বইটির কিছু তথ্য লেখকের ভাষায় হুবহু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।তিনি লিখেছেন:যেহেতু আমি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংগঠন ‘ডিজিএফআই’ তথা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি, সেহেতু এ দেশের বুকে র’-এর অপতৎপরতা সম্পর্কে আমার অল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন এ দেশে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বৈরী গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে এ দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে অবশ্যই অবহিত ও সচেতন থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছে বলে তাদের পরবর্তী সকল কার্যক্রমকে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। বরং একটি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আর তাই স্থায়ীভাবে কাউকে আমাদের শত্রু বা মিত্র বলে জ্ঞান করার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। আজ যে আমাদের পরম মিত্র, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাল সে ঘোরতর শত্রু বলে পরিগণিত হতে পারে। আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের নজির বিরল নয়।তিনি তার বইটিতে বাংলাদেশে র’এর অপকীর্তি সম্বন্ধে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দেশের মানুষকে ব্যপকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। তিনি র-এর সেসব অপকীর্তি তালিকা আকারে সে বইতে উল্লেখ করেছেন:

১) পার্বত্য চট্টগ্রামে (সন্ত্রাসী) শান্তিবাহিনী গঠন করে যাবতীয় উপায়ে ভারতীয় সেনারা প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী ২৫ বছর যুদ্ধ করেছে। বহু অন্যায় দাবিতে তারা বিদ্রোহ করেছে এবং বাঙালিদের হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের সকল দাবি মেনে নিয়ে বাঙালিদের নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দিয়েছে।

২) প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা: লেখক অনেক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, ভারত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হটিয়ে একটি বন্ধুভাবাপন্ন শক্তিকে ক্ষমতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে। জিয়া হত্যার খবর পেয়ে শেখ হাসিনা ব্রাক্ষণবাড়িয়া সীমান্ত দিয়ে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা বাধ সাধায় তিনি সে যাত্রায় পার হতে পারেননি।

৩) স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন: ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পরের দিনই 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' নামে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছিলো। এক সময়কার আওয়ামীলীগ নেতা ডঃ কালীদাস বৈদ্য 'বঙ্গসেনা' নামে একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীও গড়ে তুলেছিলো। খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুয়িা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে এই হিন্দুর্রা গঠনের চক্রান্ত চালানো হয়েছিলো। এটার পেছনেও র' এর হাত ছিল।

৪) বাংলাদেশ সরকারের ভেতরে-বাহিরে ৩০ হাজার র'-এর এজেন্ট তৎপর শিরোনামে তিনি লিখেছেন, মন্ত্রী, এমপি, আমলা, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, অফিসার, কর্মচারী পর্যায়ের লোকজনই শুধু নয়; ছাত্র, শ্রমিক, কেরানী, পিওন, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি, টেক্সিড্রাইভার, ট্রাভেল এজেন্ট, ইন্ডেটিং ব্যবসায়ী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, নাবিক, বৈমানিক, আইনজীবিসহ বিভিন্ন স্তরে তাদের এজেন্ট সক্রিয় রয়েছে।

৫) ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি: এ কমিটির পেছনেও র'-এর হাত রয়েছে বলে লেখক তার বইতে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও যদি আরো সংযুক্ত করতে চাই,তাহলে। বলবো বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে দূর্বল করে ভারতের পা ছাটা বানাতে-

২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহ নামে সংঘটিত বিডিয়ার হত্যাকান্ড। ২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডে যুক্ত ছিলো "র" এর এজেন্ট, যাদের হাতে খুন হয় বাংলাদেশ এর ৫৭ জন বিডিআর কর্মকর্তা।

মো:মোস্তাফিজুর রহমান হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল।বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স প্যারা কমান্ডো বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।তিনি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানান যে,বাংলাদেশ কমান্ডো বাহিনীর প্রশিক্ষণ এর সিলেবাস চুরি করেছে ভারত।এছাড়াও পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামরিক বাহিনীতেও র এর এজেন্ট পাওয়া গিয়েছে, যারা বাংলাদেশ এর তথ্য পাচার করতো। ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত এম এ মতিন বলেছেন-ধানমন্ডিস্থ ভারতীয় দূতাবাসের অভ্যন্তরে কুটনৈতিক হিসেবে কর্মরত অনেক কর্মচারীরাও র এর সক্রিয় সদস্য (বাংলাদেশ র বই-২৫৪ পেইজ)

এছাড়াও "র" সবচেয়ে কার্যকর ছিলো বিগত আওয়ামিলীগ শাসন আমলে,কারণ তারা এমন একটি সরকার চাইতো বাংলাদেশে যাকে পাপেট এর মতো ব্যবহার করবে,আর এইজন্য

সবচেয়ে উপযোগী ছিলো শেখ হাসিনা,এবং তার মন্ত্রীদেরকে অর্থ এবং সম্পদের লোভে তারা মগ্ন রাখতো।অন্যদিকে বাংলাদেশ এর বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের মিশন পরিচালনা করতো।৫ আগষ্ট শেখ হাসিনার পতনের বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়।

বাংলাদেশের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগতে হিন্দুত্ববাদী অনুপ্রবেশ:

সমাজবিজ্ঞানী ঊ. ই. ঞধুষড়ৎ বলেন, 'সংস্কৃতি একটি সমাজের আয়না, কিন্তু সেই আয়নায় যদি সমাজের চিত্র না ফুটে, সমাজের বিপরীত কিছু ফুটে ওঠে, তবে সমাজের অসংগতি দেখা দেবে।
কোনো জাতির স্বকীয়তা, জাতীয়তা, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ তার সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে। তেমনি সংস্কৃতিতে বিজাতীয় আগ্রাসন একটি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস বলেছেন, 'কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে, আগে সে জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও।'

বাংলাদেশে ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রবল। বাংলাদেশে বিদেশী টিভি চ্যানেলের শতকরা ৯০ শতাংশই হলো ভারতীয়। বাংলাদেশে ভারতের এত বিশাল সংখ্যক টিভি চ্যানেল দেখানোর অনুমতি থাকলেও ভারতে বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেল দেখানোর অনুমতি নেই। ব্লিৎসের এক জরিপে দেখা যায়, প্রতি মাসে ভারতীয় চ্যানেল স্টার প্লাস ১৯৫ হাজার ডলার, স্টার মুভিজ ১১৮ হাজার ডলার, সনি ১২৩ হাজার ডলার, স্টার গ্লোল্ড ৬১ হাজার ডলার, জি সিনেমা ৯৫ হাজার ডলার আয় করে। এ তালিকা আরো দীর্ঘ করা যাবে।

শুধু আর্থিকভাবে নয়; এসব চ্যানেলের অনুষ্ঠান ও বিষয়বস্তু সমাজ মননে গভীর প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও এসব ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের পরিবারগুলোকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে।ভারতীয় এই সিরিয়াল এবং মুভি গুলো যেমন অশ্লীলতার ছড়াছড়ি এর পাশাপাশি এরা সমাজে দিচ্ছে নৈতিকতাহীন সম্পর্ক, অবৈধ প্রেম,পরকীয়া, মিথ্যা ছলচাতুরী এমনকি ধর্মীয় নিয়মনীতিকেও এখানে কুসংস্কার বলে ছড়ানো হয়।
এটি স্পষ্টত একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে তার বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
আমাদের মুসলিম পরিবার গুলো এই সিরিয়াল বা মুভির বিষে জর্জরিত, পরিবারগুলো ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে,এবং পরিবারে অশান্তি এছাড়াও এই সিরিয়ালকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।বেসরকারি এক জরিপে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোয় প্রচারিত অপসংস্কৃতিতে ভরা নাটক-সিরিয়ালে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে'। ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশনের (এফটিপিও)

সভাপতি বলেন, 'ইদানীংকালে দেশে ৮০ শতাংশ বিবাহ বিচ্ছেদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কারণ হলো ভারতীয় সিরিয়াল।' ভারতীয় সিরিয়াল দেখাকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার ঘটনাও কম নয়।পরিসংখ্যান বলছে, 'ভারতীয় সিরিয়াল দেখাকে কেন্দ্র করে ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪৭ জন আত্মহত্যা করেছে।'
বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে মুভি এবং হিন্দি গান গুলো অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে,
ছোট বাচ্চাদের কার্টুনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি তাদের মননে প্রবেশ করানো।
তাছাড়াও বর্তমানে বিয়ে বা আমাদের যেকোনো অনুষ্ঠানে মুসলিম সংস্কৃতি বা বাংলাদেশী সংস্কৃতির বদলে জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি।
শুধু অনুষ্ঠান নাহ,আমাদের পোশাক থেকে শুরু করে শিক্ষাউপকরণে তাদের এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এর প্রভাব বিস্তার করছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির চলমান আগ্রাসন নতুন প্রজন্মকে নিজস্ব সংস্কৃতি বলয় থেকে দূরে নিক্ষেপ করছে। সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুকে (Facebook) পাঁচ হাজারেরও বেশী তরুণ-তরুণীর প্রোফাইল দেখে জানা গেছে, যে দেশের জনগণ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, সে দেশের নতুন প্রজন্মের নিকট প্রিয় সিনেমার তালিকায় হিন্দি সিনেমার আধিপত্য। ভারতীয় রাজনৈতিক ও কলাম লেখক 'শশী থারু' তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'বলিউড হল সফ্ট পাওয়ার।

ভারতীয় এই সিরিয়াল,মুভিগুলোতে ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি ছড়ানো হচ্ছে প্রচন্ড ইসলামবিদ্বেষ,যেখানে খলনায়ক বা ভিলেন এর ভূমিকায় দেখানো হয় কোনো দাড়িওয়ালা মুসলিমকে,অথবা জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করাহয় মুসলিমকে।এই সকল চরিত্রের মাধ্যমে, মুসলমানদেরকে কৌশলে উপহাস এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের সহানুভূতিমুলক মনোভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।অন্যদিকে মুসলমান চরিত্রকে লোভী, শত্রুতাপূর্ণ, দুর্বল ইচ্ছা শক্তি এবং দুর্বল প্রত্যয়ের অধিকারী হিসেবে, সন্ত্রাসী বা মাফিয়া চক্রের নেতা, অস্ত্র- মাদক চোরাকারবারী, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টিকারী, খুনী, প্রতারক বা নির্মম অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভারতের ছায়াছবি নির্মাতাগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছায়াছবির মাধ্যমে অপপ্রচার চালায়
হিন্দুদের শত্রু হিসেবে মুসলিমদের উপস্থাপন হয় যা বিদ্বেষ ছড়ায়। এখন তো ওরা ওদের মুভির মাধ্যমে সরাসরি অখন্ড ভারত নিয়ে কথা বলে।

তাদের এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এর কিছু লক্ষ্য রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো:

১-সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে অখন্ড ভারত গ্রহন করার জন্য বাংলাদেশীদের মনোযোগত প্রস্তুত করা।

২-বাংলাদেশের তরুণ-যুবক সম্প্রদায়কে অশ্লীলতার মাদকে বুদ রেখে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় রাখা

৩-ইসলামি সংস্কৃতিকে জঙ্গি সংস্কৃতি এবং ভারতীয় হিন্দুয়ানি সংস্কৃতিকে বাংলাদেশ এর সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে।

৪-সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি করা

এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের যে কালচারাল সেন্টার গুলো আছে তারা এখানে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আড়ালে গুপ্তচরবৃত্তি করে থাকে।

শিক্ষা ও পাঠ্যবইয়ে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের প্রভাব:

হিন্দুত্ববাদ এর থাবা পড়েছে বাংলাদেশ এর শিক্ষাঙ্গনেও,আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠপুস্তকেও তারা তাদের আগ্রাসন এর আধিপত্য রেখেছে।ভারতের হিন্দুত্ববাদের উত্থান এর পর সেটির প্রভাব বাংলাদেশে এসে পড়েছে,তারই ফল জাতীয় পাঠপুস্তক হিন্দুত্ববাদকরণের প্রচেষ্টা। প্রথম বিতর্ক ওঠে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে সরকারের নতুন পাঠ্যবই বিতরণকালে। তখন শিক্ষার্থীদের দেয়া কয়েকটি নতুন বইয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবধারার কন্টেন্টগুলো বাদ দিয়ে পাঠ্যবইয়ের হিন্দুত্বকরণ ঘটানো হয়। ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন মুসলিম লেখকদের রচনাসমূহ বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও ইসলামবিদ্বেষী সেকুলার কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় সয়লাব করে ফেলা হয়।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে নতুন পাঠ্যবই বিতরণের সময় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বইকে কেন্দ্র করে আবারও বিতর্ক শুরু হয়। বই দুটিতে দেখা যায়, পৌরাণিক কাহিনী, পৌত্তলিকতা, হিন্দুত্ববাদী ধ্যান-ধারণা ও মুসলিমবিদ্বেষী ইতিহাসের বয়ানে ভরপুর! এতে দেশপ্রেমিক নাগরিক সমাজ হতবাক হয়ে যান। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনপূর্ব মুসলিম শাসকদের ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থার কথা সর্বজনবিদিত। ২০১৮ সালের আগস্টে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেয়া এক আলোচিত সাক্ষাতকারে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ^বিদ্যালয়ে এশিয়া চর্চার অধ্যাপক ও ভাষাতাত্ত্বিক শেলডন পোলক বলেছিলেন, ‘মুসলমান শাসকরা জোর করে ধর্মান্তর করালে ভারতে একজনও হিন্দু থাকত না। কারণ, মুসলমান শাসকরা ভারতে প্রায় বারোশো বছর রাজত্ব করেছিলেন।’ অথচ ওই পাঠ্যবই দুটিতে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের বয়ান ঢুকিয়ে উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনপূর্ব মুসলিম শাসকদের মিথ্যাচারপূর্বক হেয় করা হয়েছে এবং অন্য ধর্মের শাসকদের তুনায় তাদের নিচুভাবে দেখানো হয়েছে

শুধু মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বাদ দেয়া হয়েছে তা-ই নয়, বরং একতরফাভাবে হিন্দুয়ানি ভাবধারা ও হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যদের জাতপাত ভেদ ও বর্ণপ্রথাকেই সঠিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ছবিসহ গ্রিক দেব-দেবীর পরিচয় ও বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদের দাড়ি-টুপি, পর্দা-হিজাব-বোরকা ও ধর্মীয় পোশাক নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যও লক্ষণীয়। যাই হোক, হিন্দুত্ববাদীদের ইতিহাস-বয়ানে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মগজধোলাই করানোর এ সুযোগ কারা কিসের স্বার্থে দিয়েছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। এমনকি সরকারি মাদরাসার পাঠ্যবইয়েও একই চিত্র পাওয়া গেছে। ইসলামবিরোধী বিবর্তনবাদ তত্ত্ব, পর্দাবিদ্বেষ ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যানধারণা সেখানেও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মাদরাসার পাঠ্যবইয়ে গান-বাজনা, ঢোল-তবলা ও ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশাকে ছবিসহ ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, পাঠ্যবইগুলোর প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ডিজাইনেও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষণীয়। মুসলিম পরিচয়, ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবধারা একেবারেই উপেক্ষিত

আমাদের দেশীয় প্রিন্টিং প্রেস শিল্পে পর্যাপ্ত সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ভারত থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। এটা কিসের ও কাদের স্বার্থে তা আর বোঝার বাকি নেই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ^াস করি, ইসলামবিদ্বেষী প্রগতিশীল ও সেকুলারগোষ্ঠী এদেশে ইসলাম ঠেকানোর জন্য কিংবা ইসলাম নির্মূলের রাজনীতি হিসেবে হিন্দুত্ববাদের দোসরে পরিণত হয়েছে। আর ইসলাম মোকাবেলায় হিন্দুত্ববাদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আমাদের জাতীয় পাঠ্যপুস্তককে প্রথম টার্গেট বানানো হয়েছে।

প্রশাসনে হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্ম:

‘পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশেরর মোট জনসংখ্যার ১০.৭% হল হিন্দু। হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের ভাষ্য অনুযায়ী সরকারী চাকুরেদের ২৫% হল সংখ্যালঘু। কিন্তু প্রশাসনে হিন্দুদের প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্যাবিনেট সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী ২০১৬ তে প্রশাসনের কমপক্ষে ২৯% চাকরি ছিল হিন্দুদের দখলে। গত ৩ বছরে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের ৩৫% এর কাছাকাছি পদ দখল করে আছে হিন্দুরা।

হাসিনা সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে প্রশাসনে স্থান পাওয়া হিন্দুরা সাধ্যমত চেষ্টা করছে নিজের স্বজাতির লোকজন দিয়ে প্রশাসনকে ভরে ফেলতে। পরীক্ষক, পরিদর্শক, ভাইবা বোর্ড সদস্যসহ বিভিন্ন পদে থাকা হিন্দুরা নানান রকম অনিয়মের মাধ্যমে অন্যান্য হিন্দুদের প্রশাসনে জায়গা

করে দিচ্ছে, এমন অনেক খবর পাওয়া গেছে। জাতীয় পত্রিকাতেও এসব নিয়ে নিউজ হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনে পদোন্নতির জন্য প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের। বছর কয়েক আগে নতুন পদ সৃষ্টি করে প্রমোশন দেয়া হয়েছে ৬৫ জনকে। এর মধ্যে ৪৫ জন হিন্দু। সরকারের পক্ষ থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। সেখানেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের। এভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ পদোন্নতি। এ প্রক্রিয়া চলছে দীর্ঘদিন, প্রায় ১০ বছর ধরে। এভাবেই বিভিন্ন স্ট্র্যাটিজিক পজিশনে পৌঁছে গেছে হিন্দুরা। দেশজুড়ে হিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি ও হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রশাসনে জায়গা করে নেয়া এই হিন্দুরা।

প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে খুব হিসেবনিকেশ করে বসানো হয়েছে হিন্দুদের। রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ – প্রতিটি ডিসি অফিসের উচ্চ পর্যায়ে এখন কোন না কোন হিন্দু আছে। বিশেষভাবে টার্গেট করে শিক্ষাখাতে জায়গা করে নিয়েছে অনেক হিন্দু। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের চেয়ারম্যান এক হিন্দু। এই মালাউনের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হচ্ছে, চলছে হিন্দুয়ানিকরণ।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ থানা ও জেলায় ওসি ও এসপি পদে বসানো হয়েছে হিন্দুদের। ১৯৭১ থেকে পরবর্তী ৩৩ বছর পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে কোন কাফির/মুশরিককে নিয়োগ দেয়া হয়নি। কিন্তু ২০১৪ থেকে স্পেশাল ব্র্যাঞ্চেও হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ডিবির প্রধানও নিযুক্ত করা হয়েছে এক হিন্দুকে। এসব হিন্দু অফিসাররা নিয়মিত মুসলিমদের উপর হম্বিতম্বি করে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করা হলে ফোন আসে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে কিংবা ভারতীয় হাইকমিশন থেকে।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কাজ করছে প্রায় ১৫/২০ লক্ষ হিন্দু। গার্মেন্টস সেক্টরসহ বিশেষ কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে টপ পজিশনগুলো এই হিন্দুরা দখল করে আছে।

১৩-বাংলাদেশে বিদ্যমান হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের গোপন তৎপরতা

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের আদলে বাংলাদেশেও তৈরী হয়েছে কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এদেশকে অখন্ড ভারতের অংশ হিসেবে তৈরী করা।কিছুদিন আগে পত্রিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামে এই বিষয়ে লেখা হয়েছে- “বিজেপির হিন্দুত্বাদী আদর্শের উত্থান ঘটেছে বাংলাদেশে”।

এই লিখা থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো কত মাত্রায় আধিপত্য বিস্তার করেছে।

ইসকন- “ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস” ইসকন এর পুরো নাম।এটি ১৯৬৬ সালের ১৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে যাত্রা করে।বাংলাদেশে ইসকনের সংগঠিত কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। এই সংগঠনটিকে ধর্মীয় সংগঠন বলা হলেও এটি কোনো ধর্মীয় সংগঠন নয়।এটি একটি উগ্রবাদী সংগঠন। মুসলিমবিরোধী বিভিন্ন কাজে ইন্ধন দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরী করার মূল কারিগর এই ইসকন।এটি ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এর বাংলাদেশ এর ক্ষেত্রে একটি সফটপাওয়ার। ২০১৪ সালে স্বামরবাগে তারাবির নামাজে বাধা দেয় ইসকন,সে সময় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়।

২০১৬ সালে ইসকনের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেয়ায় ২০১৬ সালে খুন হয় সিলেটের এক মসজিদের ইমাম।

এছাড়াও বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকান্ডে জড়িত ছিলো ইসকনের সদস্য অমিত সাহা।

ইসকন তাদের কার্যক্রম এর আড়ালে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রসাদ খাইয়ে “হরে রাম হরে কৃষ্ণ” মন্ত্র পাঠ করিয়েছিলো।

বাংলাদেশে সনাতন মন্দিরগুলো দখল করা এবং সনাতনদের মেরে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া। যেমন স্বামীবাগের মন্দিরটি আগে সনাতনদের ছিলো, পরে ইসকনরা কেড়ে নেয়।

২০২১ সালে মার্চ মাসে স্থাপনা নির্মান নিয়ে ইসকন চট্রগ্রামের সনাতনী হিন্দু প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক সংঘের উপর আকস্মিক হামলা চালায়,এতে ১২ জন গুরুতর আহত হয়।

এছাড়াও ইসকনের আশ্রম বলাৎকারের কেন্দ্রভূমি।

গত দশকধরে জুলুম চালানো স্বৈরাচারী শেখহাসিনার ঘনিষ্ঠ লোকছিলো এই ইসকন রা।ইসকন রা তাদের এই তৎপরতা ঐ সময়ে এতটাই চালিয়েছে যে তাদের কোনো অন্যায় এবং অপরাধ এর ফিরিস্তি কোনো মিডিয়া বা সংবাদপত্রে নেই।এছাড়াও তাদের হাত এতটাই লম্বা ছিলো যে অপরাধ করলেও তারা পার পেয়ে যেত খুব সহজে।

কিন্ত ২০২৪ এর হাসিনা সরকার পতনের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরী করে তারা চেয়েছিলো বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করতে।

ইসকন এর নেতা ভন্ড চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ,

চট্রগ্রাম এর হাটহাজারী গলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টার অংশ হিসেবে সহিংসতায় সেনাসদস্য ও পুলিশবাহিনী সদস্যদের ওপর ভয়ংকর এসিড হামলায় নেপথ্যে তার ভূমিকা ছিলো।

এছাড়াও চট্রগ্রাম নিউমার্কেট চত্ত্বরের মুক্তমঞ্চে জাতীয় পতাকার উপর গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়।

এ ব্যাপারে তাকে আদালতে নেওয়া হলে সেখানে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে উগ্র ইসকনের সদস্যরা।এবং মসজিদে হামলা ও ভাংচুর করা হয়,এবং নিরীহ মুসল্লিদের আহত করা হয়।
এছাড়াও এই উগ্র সন্ত্রাসীরা আদলত প্রাঙ্গণে সাইফুল ইসলাম আলিফ নামের আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যা করে।(২৭ নভেম্বর-২০২৪ যুগান্তর)
এছাড়াও আদলত প্রাঙ্গণে সেই বিতর্কিত জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া হয় যা ভারতের হিন্দুত্ববাদের স্লোগান।

ইসকনের সাথে যে এই হিন্দুত্বাদী সংগঠন এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই চিন্ময়কে গ্রেপ্তার করার পর ভারতের RSS বাংলাদেশকে আদেশ দেয় চিন্ময়কে মুক্তি দিতে।
এই থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ইসকন হিন্দুত্ববাদীদের আরেকটি সংগঠন যাদের উদ্দেশ্য ঠিক একই,অখন্ড ভারত তৈরী করা।আর তাদের সাথে যুক্ত ভারতের সব হিন্দুত্ববাদী মহল।

বাংলাদেশ হিন্দুমহাজোট :বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত, এ দেশে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের শিকড় ২০০৬ সালে বিজেএইচএম বা হিন্দু মহাজোট গঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের নেতারাই জয় শ্রীরামের মতো স্লোগানের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। (জয়শ্রীরাম একটি বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী স্লোগান)
২০০৬ সালে ঢাকায় গঠিত হয় হিন্দু অধিকার সংগঠন বিজেএইচএম। বাংলাদেশ হিন্দু ছাত্র মহাজোট ও হিন্দু যুব মহাজোট বিজেএইচএমের ছাত্র ও যুব শাখা। বাংলাদেশের অনেকে মনে করেন, এই সংগঠনের ভেতরেই এ দেশের হিন্দুত্ববাদের শিকড় নিহিত। তাদেরকে একসঙ্গে সংঘ পরিবার বা আরএসএস পরিবার হিসেবে ডাকা হয়। হিন্দুত্ববাদ হলো এদের স্বঘোষিত আদর্শ। এ আদর্শকে এরা ‘হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’ বলে আখ্যা দেয়।

বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিজেএইচএমের এক নেতা দ্য ডিপ্লোম্যাটকে বলেছেন, বাংলাদেশে ভারতের হিন্দুত্ববাদের প্রতীক, যেমন ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান, ক্রুদ্ধ হনুমানের ছবি, রামনবমীর মতো অনুষ্ঠান এবং লাভ জিহাদের মতো বিভিন্ন ইস্যুতে প্রচার-প্রচারণার ব্যবহার জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে ২০২২ সালে।
এই হিন্দুমহাজোটের মহাসচিবের সরাসরি একটি বক্তব্যে দেখা যায় যে,উনি অখন্ড ভারত যাতে প্রতিষ্ঠা হয় সেই ব্যাপারে প্রার্থনা করছেন এবং বিজেপি কে এই ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এই ব্যাপারেও বলেন।এছাড়াও তাদের হিন্দু যুব মহাজোট ইউনিট টি রয়েছে,তারা “লাভ জিহাদের” নামে নোংরা হিন্দুত্ববাদী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আর এই লাভ জিহাদ মানে হলো তারা কোনো মুসলিম ছেলে বা মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে তাদেরকে হিন্দু ধর্মান্তরিত করা।এবং তাদের গর্ভে হিন্দুদের বাচ্চা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

আর এক্ষেত্রে এরা বেশি ব্যবহার করছে মুসলিম মেয়েদের।মুসলিম মেয়েদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে এবং তাদের ইমোশনালি ব্লাকমেইল করে নিজেরা মুসলিম হবে বলে দাবি করে তাদেরকে ধর্ষণ করে। অথবা পরবর্তী তে হিন্দু হবার জন্য জোর করে।

শুধু এখানে তাদের কার্যক্রম শেষ নাই,

যারা হিন্দু থেকে মুসলিম হচ্ছে তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা সেটা না মানলে তাদেরকে খুন করার মতো ঘটনাও ঘটায় এই সংগঠন এর লোকজন।

১৪-ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে হিন্দুত্ববাদী অপপ্রচার ও উসকানি

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। এখানে হিন্দু,বৌদ্ধ খ্রিস্টান অন্যান্য ধর্মালম্বীরাও বসবাস করে।কিন্ত হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠন গুলোকে দেখা যায় প্রায়ই তারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এর মিথ্যা তথ্য এবং অপপ্রচার চালায়।এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু নির্যাতন এর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা।

২০১৯ সালে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহা হোয়াইট হাউজের এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হিন্দু নির্যাতন নিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায়,সেখানে সে জানায় বাংলাদেশ থেকে ৩৭ মিলিয়ন(৩ কোটি ৭০ লক্ষ) হিন্দু নাকি নিখোঁজ হয়েছে।এবং বাংলাদেশে নাকি হিন্দুরা নির্যাতিত, অথচ এই বিষয়ে বাংলাদেশে তদন্ত করে দেখা যায় যে তার এই পুরো ঘটনাটাই বানোয়াট। অন্যদিকে প্রিয়া সাহার বক্তব্যের পর উগ্রবাদী হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হয় যে বাংলাদেশ থেকে আসলেও ৩ কোটি হিন্দু নিখোঁজ হয়েছে এবং তারা আশ্রয় নিয়েছে ভারতে।এবং তারা ভারতের আসাম,পশ্চিমভঙ্গ এবং ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে,এটার উদ্দেশ্য হলে ভারত যে ৩০-৪০ লক্ষ্য মুসলিমের নাগরিককত্ব বাতিল করেছে সেই ব্যাপারে প্রচারণা চালানো।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলো প্রায়ই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং প্রচারণা চালায়,অথচ তাদের দেশে মুসলিম রা কি পরিমানে নির্যাতিত হয় সেই ব্যাপারে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। (আমেরিকার Few research center এর গবেষণা অনুযায়ী বিশ্বের যেসব দেশে সর্বাধিক ধর্মীয় সহিংসতা ঘটে এমন ৫ টি দেশে মধ্যে ভারত

অন্যতম।)আর এই ইস্যুকে ব্যবহার করে বহির্বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ এর ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।তাছাড়া বিজেপি সরাসরি বাংলাদেশ দখলের হুমকিও দিয়েছে।

২০১৬ সালের আগস্ট ঢাকার টঙ্গি বাজারে শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরে কতিপয় যুবক হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙ্গচুর ও পুরোহিতকে মারধরের চেষ্টার অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। 'আল্লাহু আকবার' বলে মন্দিরে হামলা চালানো যুবকদের নেতৃত্বে থাকা যুবক র‍্যাবের হাতে আটক হওয়ার পর জানা যায়, তার নাম সঞ্জয় কুমার সাহা। সে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সাহাপাড়া গ্রামের গণেশচন্দ্র সাহা এবং শুভা রানী সাহার পুত্র। ২০২২ সালের মে মাসে খুলনার ফুলতলা এম এম কলেজ সার্বজনীন পূজা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙ্গচুর করে পালানোর সময় স্থানীয়রা সন্দেহ করে এক যুবককে আটক করে তার ব্যাগ তল্লাশি করে ব্যাগে ভাঙ্গা প্রতিমার মাথার অংশ উদ্ধার করা হয়। তার নাম অনিক মন্ডল। সে অভয়নগর উপজেলার ধুলগ্রামের অসীম মন্ডলের পুত্র। বাংলাদেশের মানুষকে হিন্দু বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতেই হিন্দু যুবকদের মুসলমান সেজে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙ্গার স্যাবোটাজের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট এর পর ভারতের এই সংখ্যালঘু নির্যাতন এর অপপ্রচার আরো বেড়ে গিয়েছে, তারা এটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে আরো অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে, বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে না জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, 'এটা ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার। সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ৫ আগস্টের পর যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, সেটি মূলত রাজনৈতিক কারণে, ধর্মীয় কারণে নয়।

এই ব্যাপারে -

এক বিবৃতিতে বিএফইউজে ও ডিইউজের নেতারা বলেন, 'আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, এই ইস্যুতে ভারতীয় মূলধারার গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে মনগড়া ও অপতথ্য দিয়ে একের পর এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ করে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে ভারতের বক্তব্য ও এর পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের উগ্র জঙ্গিদের দ্বারা আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা ও বাংলাদেশের পতাকা ছিঁড়ে ফেলা, কলকাতা ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের উপহাইকমিশনের সামনে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো যুদ্ধংদেহী বিক্ষোভ দেখিয়েছে"

বিভিন্ন ফ্যাক্ট চেকিং (তথ্য যাচাইকারী) প্রতিষ্ঠানের জরিপের তথ্য উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতের ভুয়া খবর বিপজ্জনক হুমকিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নিয়েও দেশটির মূলধারার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম যাচাই-বাছাই না করেই বিভিন্ন ভুল খবর প্রকাশ করছে।

সাংবাদিক নেতারা বলেন, ‘ভারত সরকারের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড এবং সেখানকার মিডিয়ার ভূমিকায় আমাদের মনে হয়েছে, তারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চায়। এতে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করানো সহজ হবে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী প্রচার ও প্রভাব:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, টুইটার এবং ইউটিউবেও থেমে নেই এই হিন্দুত্ববাদীদের প্রচার ও প্রভাব।

তারা এই মিডিয়া এবং যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন চালায়।এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ভুয়া খবর এবং ধর্মীয় উসকানি ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলমান এর মধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরী করে।

এবং যারা এই হিন্দুত্ববাদের বিপক্ষে কথা বলে বা তাদের এই অন্যায় নিয়ে প্রতিবাদ করে তাদেরকে খুন,গুম এবং অপহরণের ও তথ্য পাওয়া যায়।এই উগ্র হিন্দুরা বাংলাদেশ ও ভারত ২ দেশের মিডিয়াতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে।

ভারতের RSS, BJP, এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো একাধিক ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল ও টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী মতবাদ ছড়াচ্ছে। এসব প্ল্যাটফর্মে বারবার "Love Jihad", "Ghar Wapsi", "Hindu Unity" ইত্যাদি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে প্রচার চালানো হয়।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী পেইজ ও গ্রুপগুলো থেকে বাংলাদেশের সংবেদনশীল ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়।
উদাহরণ: কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতনের পুরোনো ভিডিওকে নতুন করে পোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো হয়।

মুসলিমদের 'সহনশীলতা নেই', 'সন্ত্রাসী', ইত্যাদি ইমেজ দিয়ে পোস্ট করা হয় যাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বাড়ে।
ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যকে অপমান করে এমন মিম ও ভিডিও ভাইরাল করা হয়।
উদাহরণ: ফেসবুকে “Hindu Unity Global” বা “Sanatan Dharma Vichar” টাইপ পেইজ থেকে বাংলাদেশি ধর্মীয় উৎসব বা ঘটনা নিয়ে কটাক্ষমূলক মন্তব্য ছড়ানো।

ফেক ফেসবুক প্রোফাইল বা পেজ খুলে কৌশলে বাংলাদেশের গ্রুপে প্রবেশ করে হিন্দুত্ববাদী বা সাম্প্রদায়িক কনটেন্ট শেয়ার করা হয়।
YouTube ও Facebook-এর অ্যালগরিদম কাজে লাগিয়ে এ ধরনের ভিডিও বা পোস্টকে “suggested content” বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

যেকোনো সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার সময় হিন্দুত্ববাদীরা “বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা হিন্দু নির্যাতনের দেশ”—এমন প্রচার চালিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা

করে।
এতে করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ে এবং সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়।

সরকার পতনের পর তারা রাজনৈতিক সমস্যা গুলোকে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং আগের ঘটনাগুলোকে নতুন ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলো,হিন্দুদের মন্দিরে আক্রমণ হচ্ছে বলে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ায়, কিন্ত বাস্তবে দেখা যায় যে মুসলিমরা হিন্দুদের মন্দির পাহারা দিচ্ছে।
এমন অসংখ্য ঘটনা বা মিথ্যা নিউজ ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়ানো,তাদের হিন্দুত্ববাদ বা অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু নির্যাতন এর দেশ বলে আখ্যায়িত করা তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

১৬-অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুত্ববাদী হুমকি ও বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা

“অখণ্ড ভারত” (Akhand Bharat) হলো একটি হিন্দুত্ববাদী মতবাদ, যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, ও আফগানিস্তানকে একত্র করে একটি একক রাষ্ট্র গঠনের কল্পনা করে। এই ধারণাটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন যেমন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)-এর কিছু অংশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।
এই মতবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো "ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন গৌরব" পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যেখানে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক-ধর্মীয় আদর্শের ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর, বিশেষ করে বাংলাদেশের, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার উপর গভীর হুমকি তৈরি হয়েছে।
Golwalkar, M. S. (1939). *We or Our Nationhood Defined*এটি RSS-এর অন্যতম আদর্শিক রচনার একটি, যেখানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের "বিদেশি" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় এবং হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়।
তাদের এই অখন্ড ভারত বিষয়ে সংগঠন গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,
RSS: অখণ্ড ভারত একটি ঘোষিত আদর্শ হিসেবে তাদের প্রচারপত্রে স্থান পেয়েছে।
VHP ও অন্যান্য শাখা: ধর্মীয় পুনর্জাগরণের নামে রাজনৈতিক আগ্রাসনকে তারা ন্যায্যতা দেয়।
BJP: যদিও সরকারি নীতিতে সরাসরি “অখণ্ড ভারত” উল্লেখ থাকে না, তবে অনেক নেতা ও মন্ত্রী এই ধারণার পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন, ভারতের লোকসভায় একাধিকবার বলা হয়েছে যে “বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এক সময় ভারতের অংশ ছিল”।
এই ব্যাপারে কিছু প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ও দলিল উপস্থাপন করলে দেখতে পাই:

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আল জাজিরার 'Head to Head' অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন আরএসএস মুখপাত্র রাম মাধব একটি সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি 'অখণ্ড ভারত' (Akhand Bharat) ধারণা সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেন।
সাক্ষাৎকারের মূল বক্তব্য:
রাম মাধব বলেন, "আরএসএস এখনও বিশ্বাস করে যে ঐতিহাসিক কারণে মাত্র ৬০ বছর আগে বিভক্ত হওয়া এই অঞ্চলগুলি একদিন জনগণের সদিচ্ছার মাধ্যমে আবার একত্রিত হয়ে অখণ্ড ভারত গঠন করবে... একজন আরএসএস সদস্য হিসেবে আমিও এই মত পোষণ করি।
(https://indianexpress.com/article/explained/rss-akhand-bharat/)
সংসদীয় বক্তব্য: 2023 সালে ভারতের কিছু রাজনীতিবিদ সংসদে অখণ্ড ভারত ম্যাপ প্রকাশ করেন, যেখানে বাংলাদেশকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।এছাড়াও তারা এখন সরাসরি সংসদে অখন্ড ভারত বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

RSS পত্রিকা "Organiser"-এ একাধিকবার অখণ্ড ভারত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
এর মাধমে এটা প্রমানিত হয় যে তাদের এক অংশ বাংলাদেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে,যা আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করতে চায়।বিজেপির নেতারা সরাসরি বাংলাদেশ দখলের হুমকি দিয়ে থাকে।
শুধু এখানে শেষ নাহ ভারতের এই হিন্দুত্ববাদী গ্রুপ গুলো একাধিকবার বাংলাদেশ এর সরকারি ওয়েবসাইট গুলো হ্যাকিং এর দাবি করেছে,যা আমাদের তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে সঙ্কা সৃষ্টি করছে।
ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) ও জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (NRC) কার্যক্রমেও বাংলাদেশকে হুমকি দিয়ে বিজেপি নেতারা সরাসরি বলেন যে বাংলাদেশ থেকে আসা "অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের" তারা ফেরত পাঠাবেন।অথচ ভারতের এই নাগরিক সংশোধনী আইন ও নিবন্ধন এর মাধ্যমে তারা তাদের দেশের মুসলিমদেরকেই বাতিল করে বাংলাদেশকে অবৈধভাবে পুশইন করছে।
সবশেষে বলা যায় ভারতের উগ্রবাদী এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার এই হুমকি এবং নীতি বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য সঙ্কাজনক।

সাম্প্রতিক আগ্রাসন, সহিংসতা ও উসকানিমূলক ঘটনা বিশ্লেষণ:

আমরা সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই আগ্রাসন এর বিষয় আরো তুলবো।

২০২১ সালের মোদি বিরোধী আন্দোলন :

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শেখ হাসিনার তাগুত সরকার গুজরাটের কসাইখ্যাত মোদিকে আমন্ত্রণ জানায়,এই বিষয়ে বাংলাদশের মুসলিম রা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে,মূলত এই ক্ষোভের কারণ মোদির দ্বারা সংঘটিত হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এর জন্য।

কিন্তু এই ঘটনায় ২৬ মার্চ মুসলিমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করলে তাদের উপর পুলিশ এবং ছাত্রলীগ আক্রমণ চালায়,এতে অনেকজন আহত হয়,এবং অনেকে নিহত হয়।

কিন্তু এই হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন এতই বেশি যে বাংলাদেশের মুসলিমদের জীবনের চেয়ে এই কসাই বাংলাদেশে সফর ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তাগুত হাসিনার কাছে।

২০২৪ সালে বন্যা-

২০২৪ সালে বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রামসহ উত্তরের ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। ভারতের মেঘালয় ও আসাম থেকে হঠাৎ করে বিপুল পরিমাণ পানি ছেড়ে দেওয়ায় আকস্মিক প্লাবন হয়। এতে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে, ফসল, ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পানি ছাড়ার আগে বাংলাদেশকে কোনো আগাম বার্তা না দেওয়ায় এটি এক ধরনের একতরফা 'পানির আগ্রাসন' হিসেবে দেখা হয়।ভারতের নির্মিত **ফারাক্কা, টিপাইমুখ, গজলডোবা** ইত্যাদি বাঁধ থেকে ইচ্ছামতো পানি নিয়ন্ত্রণ করায় বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যা ভয়াবহ রূপ নেয়।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও জলসম্পদকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একধরনের **জল-নির্ভর আধিপত্য** কায়েম করতে চায়।

এটি শুধু একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং সুপরিকল্পিত এক **জিও-পলিটিক্যাল চাপ সৃষ্টি**— যার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, এবং অর্থনীতিকে দুর্বল করার অপচেষ্টা চলছে।

২০২৪ সালে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনে হামলা এবং জাতীয় পতাকা অবমাননা:

বাংলাদেশে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস গ্রেফতারের পর প্রতিবেশী দেশ ভারতে ডেপুটেশন জমা, মিছিল-সমাবেশ, কুশপুত্তলিকা দাহসহ নানা ধরনের বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে,এর রেশ ধরে এরা বাংলাদেশের হাইকমিশনে হামলা ভাঙ্গচুর করে এবং জাতীয় পতাকা অবমাননা করে।

এই ঘটনা একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ইসকন একটি উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, আর ইসকনের নেতা গ্রেফতারের পর এই বিক্ষোভ ভারতের ঐ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনই করবে।

২০১৯ এবং ২০২৪ সালে আবরার ফাহাদ এবং এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা-

২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর, বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ-কে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিবির সন্দেহে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। সে ভারতের সাথে করা কিছু দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তির বিরোধিতা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিল। এবং ভারতের আধিপত্য নিয়ে কথা বলেছিলো,আর এইজন্য তাকে মেরে ফেলা হয়।

২০২৪ সালে ইসকন এর সন্ত্রাসীরা আাদলত প্রাঙ্গণে এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুফিয়ে হত্যা করে,তাদের এই আগ্রাসন এর মূল কারণ ছিলো তাদের হিন্দুত্ববাদী নেতার জামিন না হওয়া।

সব গুলো ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন আমাদের এই দেশকে ছেয়ে গেছে।এবং প্রত্যেকটি অঙ্গনে ওরা আগ্রাসন চালাচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদ প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির পুনর্মূল্যায়ন

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও বিভিন্ন গোয়েন্দা এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের।এই বিষয়ে আমাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে অতিমাত্রায় বন্ধুত্বপূর্ণ রাখতে গিয়ে অনেক সময় ন্যায্য অধিকার, ধর্মীয় ও জাতিগত স্বার্থ নিয়ে কঠোর অবস্থান নেয় না । যেমন: সীমান্তে হত্যা, পানি সমস্যা, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র চুক্তি, মুসলিম নিপীড়ন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ বরাবরই 'নরম' ভূমিকা নিয়েছে।

প্রতিবছর তারা আমাদেরকে যে তাদের পানির বাঁধ গুলো খুলে বন্যায় ভাসিয়ে দেয়,এবং খরা মৌসুমে পানি দেয়না এই বিষয়ে কথা বলতে হবে,আমাদের ন্যায্য পানির হিস্যা দিতে হবে,এবং আলোচনার মাধ্যমে বাঁধ কখন খুলবে এবং কখন বন্ধ করবে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

তাছাড়া আমাদের দেশ থেকে যেমন তারা ট্রানজিট থেকে শুরু করে যেসব সুবিধা নিয়েছে আমাদেরকেও সেসব সুবিধা দিতে হবে।

ভারতের মণিপুর, আসাম, জম্মু-কাশ্মীরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, মসজিদ ভাঙচুর, মুসলিমবিরোধী আইন—এসব বিষয়ে বাংলাদেশ কখনোই সরকারিভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেনি, যা মুসলিম জনগণের অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশকে কেবল ভারতের উপর নির্ভরশীল না হয়ে চীন, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। একক কূটনৈতিক নির্ভরতা জাতীয় স্বার্থের জন্য হুমকি।

ভারতের সাথে প্রভূভক্ত আচরণ না করে তাদের সাথে আমাদের জবাবদিহিমূলক আচরণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বাংলাদেশ এর সাথে শোষন এর যেই চুক্তিগুলো তারা করেছে সেগুলো বাতিল করতে হবে।সাম্রাজ্যবাদী ও কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা পরিহার করতে হবে।

১৯- সীমান্ত নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত, যা প্রায় ৪,০১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। ভারতের পক্ষ থেকে হিন্দুত্ববাদী নীতি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক চাপের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা একটি জাতীয় নিরাপত্তার অপরিহার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত রোধ করতে হবে।
ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর প্রভাব ও আগ্রাসন থেকে স্থানীয় জনগণকে সুরক্ষা দিতে হবে।
ভারতের সঙ্গে সীমান্ত লঙ্ঘন, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে নিয়মিত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান।
ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির সীমান্তবর্তী এলাকায় সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। তাই এই বিষয়ে সীমান্তবর্তী মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২০-সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা:

ভারতীয় এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে বাঁচতে আমাদেরকে বিকল্প উপায় বের করতে হবে, সে হিসেবে বলা যায় তাদের এই সংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে আমাদের বিকল্প ইসলামিক সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে।আমাদের পরিবার এবং সমাজে সুস্থ বিনোদন এর চর্চা করতে হবে।এছাড়াও সব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এর বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে,
হিন্দুত্ববাদী এই মিডিয়াগুলো কিভাবে আমাদের দ্বীন এবং দুনিয়া ধ্বংস করছে সে বিষয়ে মুসলিম ছেলে-মেয়ে এবং পরিবারগুলোতে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
এসব নাটক-সিরিয়াল, হিন্দি গান মনে কুফরের সৃষ্টি করে,এর পরিবর্তে কুরআন এবং হাদীসের সঠিক চর্চা,ইসলামি সঙ্গীত,ইসলামি কুইজ এবং ইতিহাস জানানোর দিকে সমাজকে আগ্রহী করে তুলতে হবে।
আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, একমাত্র ইসলামই পরিবার ব্যবস্থাকে শান্তিময় করেছে। পিতা-মাতা, বয়োবৃদ্ধ, শিক্ষক ও অভিভাবককে সম্মান করতে শিখিয়েছে, মেহমানদারী করতে শিখিয়েছে, বিপন্নকে বুকে তুলে নিতে বলেছে, গরীবকে দান করতে শিখিয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মীয় অনুশাসনকে সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যায় এবং প্রত্যেক মানুষকে স্বশাসিত করে তোলে বা একটি কর্তৃপক্ষীয় ভূমিকা পালন করে। আর এসব অর্জনের জন্য শিশুকাল থেকেই

সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান ও আমলে উৎসাহী করা। মা, বাবা, ভাই, বোন ও স্ত্রীকে দ্বীনি তালিম তরবিয়ত দেয়া ও সুস্থ সংস্কৃতির আহ্বান পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে পরিবারকে আগ্রাসনে হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব।

পাঠ্যক্রম থেকে হিন্দুত্ববাদী বিষয় বাদ দেওয়া এবং সঠিক ইতিহাস জোরদার করা:

আমাদের মুসলিমদের যে সুন্দর সোনালি ইতিহাস রয়েছে এসব কিছু মুছে ফেলার চেষ্টা করছে এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলো,এর প্রচারণা স্বরুপ তারা আমাদের শিক্ষার্থীদের সঠিক ইতিহাস না জানানোর জন্য আমাদের পাঠ্যক্রমে মুসলিমদের ইতিহাস সরিয়ে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসের প্রচারণা চালাচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে,এবং শিক্ষানীতি গুলো পরিবর্তন করতে হবে,আমাদের মুসলিমদের যে গৌরবান্বিত ইতিহাস তা এখানে যুক্ত হবে।

আর এই বিষয়টি যদি ঠিক করা যায় তাহলে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন থেকে আমাদের প্রজন্মকে রক্ষা করা যাবে।

মুসলিম শাসনামলে বঙ্গদেশে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ন্যায়বিচার ও অর্থনীতিতে যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল, তা তুলে ধরা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ:

সুলতানি ও মোগল আমলে বাংলার স্বর্ণযুগ: এই সময়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয় (চণ্ডীদাস, আলাউল), নগরায়ণ ও স্থাপত্যে (লালবাগ কেল্লা, সাত গম্বুজ মসজিদ) মুসলিম শাসকের বিশাল অবদান ছিল।

কিন্ত সিরাজুদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে যখন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবে যায়,যখন বিট্রিশ রা ক্ষমতা হাতে নেয় এই হিন্দুরাই(হিন্দুদের বিশেষ শ্রেণী) তখন বিট্রিশদের সাথে যুক্ত হয়ে বাংলার মানুষদের অত্যাচার ও নিপীড়ন ও চালায়,হিন্দুদের জমিদার শ্রেনী মুসলিম এবং নিম্নবর্গের হিন্দুদের শোষণ করা শুরু করে।এবং বিট্রিশদের তোষামোদ এবং অন্যায়ে সাহায্য করে,কিন্ত মুসলিমরা এক্ষেত্রে আপোষ করেনি,যার পরিমাণে বারবার গড়ে তোলে তারা বিদ্রোহ, তারই ফলস্বরূপ হয় কতগুলো আন্দোলন, ফকির সন্নাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি।

এসব কারণে বিট্রিশদের সাথে মুসলিমদের দূরত্ব বাড়ে, অবশেষে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলেও হিন্দুরা এটার চরম বিরোধিতা করে,কারণ বঙ্গভঙ্গের কারণে মুসলিমরা তাদের আলাদা অঙ্গরাজ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো,এই সময়ে হিন্দুরা জাতীয়তাবাদের নামে চরম মুসলিম বিদ্বেষী লেখালেখি করেন।পরবর্তী তে হিন্দুদের চাপের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় বিট্রিশ সরকার।

হিন্দু মহাসভা (১৯১৫) ও আরএসএস (১৯২৫):

এই সংগঠনগুলো "হিন্দু রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। মুসলমানদের "বিদেশি" বা "ঘুসপেটিয়া" আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায়।
মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে পুনরায় হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার আদর্শ প্রচার করে।
১৯২০–৪০ এর দশকে বারবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়।
মুসলিমদের উপর আক্রমণের ঘটনা, যেমন কলকাতা (১৯৪৬) ও বিহার (১৯৪৬) হত্যাকাণ্ডে হিন্দু চরমপন্থীরা সক্রিয় অংশ নেয়।
কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা চায়নি মুসলমানরা পৃথক রাষ্ট্র পাক। মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধেই তারা 'অখণ্ড ভারত' ধারণা প্রচার করে।
দেশভাগের সময় বহু হিন্দু নেতা ও সংগঠন পূর্ব বাংলাকে ভারতের অংশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল
কিন্তু মুসলিম নেতা এবং নেতৃত্বের কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ পাই ১৯৪৭ এ।
এতকিছুর পরও আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম এ এই হিন্দুত্ববাদীদের গুনকীর্তন করা হয় অন্যদিকে মুসলিমদের ইতিহাস মুছে ফেলা হয়,যার জন্য আমরা আত্মপরিচয়ের সংকট ভুগতে হয়।
মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের বন্ধুত্ব নামক এই অপপ্রচার এর মিথ আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে।ভারত কখনোই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র নয়,তারা আমাদের সূচনালগ্ন থেকেই শোষণ করে আসছে এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে আসছে,এই বাস্তবতাকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।তাই আমাদের নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানোর দায়িত্ব আমাদেরই।

৩-সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল প্রতিরোধ কৌশল

হিন্দুত্ববাদীরা প্রতিনিয়ত ই ডিজিটাল মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের প্রচারণা এবং আগ্রাসন চালাচ্ছে,এবং বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে,এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো আমাদেরও নিজস্ব মুসলিম কমিউনিটি ভিত্তিক ইসলামিক মিডিয়া,ইউটিউব চ্যানেল এবং সোশ্যাল এপ তৈরী করতে হবে।
যার মাধ্যমে আমরা সত্য ইতিহাস এবং দাওয়ার কাজ করতে পারবো।**সংবেদনশীল ইস্যুগুলোতে নিজেদের কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবে**।
মুসলিম তরুণদের নিয়ে গঠন করতে হবে **"সাইবার প্রতিরোধ টিম"**, যারা হিন্দুত্ববাদীদের মিথ্যাচার ও হ্যাকিং তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা কৌশলে কাজ করবে।

ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স (Twitter)-এ ইসলামবিদ্বেষী কনটেন্টের বিরুদ্ধে **গোষ্ঠিগত রিপোর্টিং টিম** তৈরি করতে হবে।
মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি ও কীর্তিকে বিকৃত করে যে প্রচার চালানো হয়, তার জবাবে **উপযুক্ত দলিল ও প্রমাণসহ কনটেন্ট তৈরি করতে হবে** (পোস্ট, ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক, রিলস)।

অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিকভাবে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করা:

হিন্দুত্ববাদের এই আগ্রাসন রুখতে তাদেরকে অর্থনৈতিক এবং বানিজ্যিক ভাবে পঙ্গু করে দিতে হবে।তাদেরকে বাদ দিয়ে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নিতে হবে।
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা।
সূরা মায়িদাহ'র ২নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।
তাদের দেশ থেকে আমাদের যে পরিমাণ পন্য সামগ্রিই আমদানি সেই পরিমাণ রপ্তানি আমরা করতে পারিনা,তাই তাদের এই আগ্রাসন রুখতে আমাদের নিজস্ব দেশে পন্য উৎপাদন এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।এতে করে আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি ও চাঙ্গা হবে এবং আমাদের দেশের টাকা দেশেই থাকবে। তাদের পন্য বয়কট করতে হবে।
আমাদের দেশের একটা বড় অংশ তাদের দেশে চিকিৎসার জন্য যায়,এবং এতে তাদের অর্থনীতির চাকা সচল হয়,কিন্ত সরকার পতনের পর দেখা যায় যে তাদের দেশ আমাদের জন্য ভিসা দেওয়া হুট করে বন্ধ করে দেয়,এবং আমাদের দেশের মানুষকে চিকিৎসা না দেবার হুমকি দেয়।যদিও আমাদের দেশের মানুষ না সেই দেশে না যাওয়াতে তাদের অর্থনীতি অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং কোটি কোটি টাকা তাদের লোকসান হয়।তাদের হোটেল, হাসপাতাল রোগী এবং কাস্টমার এর অভাবে ভূগতে থাকে।এইজন্য আমাদের নিজেদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
এছাড়াও ভারতের যেই হিন্দুত্ববাদী চ্যানেলগুলো আমাদের পরিবার গুলো নষ্ট করছে কিন্ত তাদের এই চ্যানেলগুলো দিয়ে তারা আমাদের দেশের অর্থ পাচ্ছে এটাও বয়কট করতে হবে,কারণ ওরা আমাদের দেশের মিডিয়া বা চ্যানেল ওদের দেশে চালু হতে দেয়না।তাই এ ব্যাপারে আমাদেরও শক্ত অবস্থান নিতে হবে।
এবং সবশেষে আমাদের মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থাও জোরদার করতে হবে,নিজেদের কোম্পানি এবং নিজেদের জন্য বিকল্প পন্য তৈরী করতে হবে।

পরিবার গুলোতে আগ্রাসন নিয়ে সচেতনতা এবং ইসলামি জ্ঞান বৃদ্ধি

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে **পরিবার ও তৃণমূল পর্যায়ে ইসলামি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হিন্দুত্ববাদ কেবল রাষ্ট্রীয় বা ডিজিটাল পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়—এটি ধীরে ধীরে সমাজের গভীরে, পরিবারে, এমনকি শিশুদের মননেও ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় সিরিয়াল, সিনেমা, ইউটিউব ভিডিও, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী অপসংস্কৃতি শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করছে। পরিবার যদি এর প্রতিরোধে সচেতন না হয়, তবে সামাজিক ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে।

এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনকে রুখতে সবার আগে আমাদের ইসলাম এবং ইসলামের ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরতে হবে।আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের পরিবার এবং আমাদের সমাজ।

মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে যে, মুসলমানেরা 'বহিরাগত' বা 'দখলদার'। পরিবারের দায়িত্ব হলো—সন্তানদেরকে সত্য ইতিহাস ও ইসলামি পরিচয়ের শিক্ষা দেওয়া।

শুধু এখানে সীমাবদ্ধ থাকলে হবেনা আমাদের পরিবারের সব সদস্য এই বিষয়ে আলোচনা করবে এবং প্রতিবেশী বা আশেপাশের সবাইকে এই ভয়ংকর আগ্রাসন নিয়ে সচেতন করতে হবে।

এর পাশাপাশি আমাদের সন্তানদের এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন থেকে রুখতে ছোট থেকেই আত্মরক্ষার কৌশল এবং শত্রুদের প্রতিরোধ করাট কৌশল শেখাতে হবে।

পরিবারের শিশু-নারী সবাইও চাইলে এই বিষয়ে আত্নরক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তত করতে পারেন।

তরুণ প্রজন্মের প্রশিক্ষণ এবং ইসলামি নেতৃত্ব উন্নয়ন:

সবচেয়ে কার্যকর বিনিয়োগ। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন যখন কৌশলে ইতিহাস বিকৃতি, সাংস্কৃতিক প্রভাব, মিডিয়া দখল এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুসলমানদের চেতনাহীন করে তুলতে চাইছে, তখন একমাত্র সমাধান—**ইসলামি আদর্শে গঠিত, প্রশিক্ষিত এবং সচেতন তরুণ নেতৃত্ব।**

এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এবং তাদের মিডিয়া বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে বিমোহিত রেখেছে বা ব্যস্ত রেখেছে অন্য কাজে তাদেরকে এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এর নিয়ে ভাবার ই সুযোগ দিচ্ছে নাহ।

কিন্ত আমাদের তরুণ প্রজন্মের উচিত হবে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদকে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করা এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা।

এছাড়াও প্রতিটি এলাকায় তারা সংগঠিত হয়ে বিশুদ্ধ আকিদা এবং মানহাজে দীক্ষিত হওয়া।এবং আসন্ন যেই বিপদ আসছে তার জন্য স্ব স্ব স্থানে থেকে নিজেকে প্রস্তুত করা।
হিন্দুত্ববাদী এই আগ্রাসন গুলোকে সাধারণ মুসলিমদের কাছে তুলে ধরা এবং তাদেরকে সচেতন করা।
ডিজিটাল মিডিয়া লেখালেখি এবং ভিডিও সম্পাদনা করে মানুষকে সচেতন করা।
এর পাশাপাশি দাওয়াত,ইদাদ,জিহাদের জযবাকে মুসলিম সমাজে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এবং গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা।

ইসলামী সংগঠনগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি:

মুসলিমদের মধ্যে দলগত বিভাজন সৃষ্টি করে হিন্দুত্ববাদীরা 'ডিভাইড অ্যান্ড উইকেন' কৌশল প্রয়োগ করছে।তাই ইসলামি সংগঠন গুলো একসাথে কাজ করতে হবে।
এবং তৃনমূল পর্যায়ে নিজেদের সংগঠন গুলোট কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে হবে।প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং গ্রামে নিজেদের দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।এর পাশাপাশি মহিলাদের জন্য পৃথক দাওয়া প্লাটফর্ম গঠন করতে হবে।
তাই তাদের এই কার্যক্রমে ইসলামি জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করতে হবে।
মুসলিমদের ইতিহাস এবং হিন্দুত্ববাদীদের ইতিহাস বিকৃতির জবাব দিতে হবে।
হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ঠেকাতে নিজেদের নিজস্ব মিডিয়া টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে।
স্কাউটিং এবং আত্মনির্ভরতা শিখানোর দায়িত্ব নিতে হবে।
এছাড়াও মসজিদ এবং মাদ্রাসাগুলোতেও অন্তত একবার হলেও হিন্দুত্ববাদী এই আগ্রাসন নিয়ে পর্যালোচনা এবং খতিবদের দিয়ে একবার হলেও এই বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বয়ানের ব্যবস্থা করা।
মুসলিম বাজার, হাট, ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে **"ইসলামি বাণিজ্য নেটওয়ার্ক"** গঠন। হিন্দুত্ববাদী পণ্যের বিকল্প উৎপাদনে সহায়তা।
মুসলিম ব্যবসায়ীদের ব্যবসা রক্ষায় **আইনি সহায়তা ও প্রচারণা**।
এছাড়াও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করা,যাতে হিন্দুত্ববাদীরা এই বিষয়ে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে।
মুসলিমদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান গুলোতে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করা।
অন্যান্য ইসলামি সংগঠনের সাথে যৌথ প্লাটফর্ম বা জোট গঠন। জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত তৃণমূলে বাস্তবায়নের কাঠামো তৈরি। আইনগত লড়াই, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ

আঞ্চলিক জোট ও বিকল্প কূটনৈতিক পথ অনুসন্ধান

ভারতের এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এর স্বীকার আন্চঞ্চলিক জোট সার্ক।সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বাংলাদেশের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, দক্ষিণ এশিয়ার অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে একটি আঞ্চলিক জোট গঠন অপরিহার্য। এ ভাবনা থেকেই তিনি ১৯৮০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি পাঠান। কিন্তু ১৯৮১ সালের ৩০ মে তিনি নিহত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়া জোট গঠন স্থবির হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে পুনরায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় দুই দিনের দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানরা সার্ক সনদে স্বাক্ষর করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব রিজিওনাল কো-অপারেশন' সংক্ষেপে 'সার্ক'। প্রথমে এ সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র ছিল সাতটি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ভুটান। পরে ২০০৭ সালে আফগানিস্তানকে সার্কের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সার্কের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ও সংস্থা রয়েছে নয়টি- চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মিয়ানমার, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরেপীয় ইউনিয়ন।

সার্ক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, বড় কোনো রাষ্ট্রর অপেক্ষাকৃত ছোট রাষ্ট্রের ওপর খবরদারি বন্ধ করা, সীমান্তবিরোধসহ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৃষ্ট সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যেকোনো উত্তেজনা প্রশমন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা। সার্ক গঠনের অন্যতম অভিপ্রায় ছিল দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিয়ে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ নানান ক্ষেত্রে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্পর্ক নিবিড় করাও সার্কের লক্ষ্য ছিল; যার ফলে সাফ গেমস, সাফ ফুটবল, সার্ক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছিল। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সার্কের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। বার্ষিক পদ্ধতিতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ও প্রতি দুই বছর অন্তর সার্ক পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রথম সার্ক চার্টারে বলা হয়েছিল, প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে সদস্য দেশগুলোর রাজধানী বা বড় কোনো শহরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হবে। এ ছাড়া সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যেও নিয়মিত কৈঠকের সিদ্ধান্ত ছিল। সার্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যাতে নিজস্ব সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অবস্থান করতে পারে। সদস্য দেশগুলোকে নিরুপদ্রব করাই

ছিল সার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সার্কের বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের অসহযোগিতামূলক ভূমিকার কারণে সেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ভারতের অনীহা ও অমতের কারণে পাকিস্তানে স্থিরীকৃত সার্ক সম্মেলনও বাতিল করতে হয়েছে। সার্ক যাতে একটি কার্যকর আঞ্চলিক ফোরাম হিসেবে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে না পারে, ভারত শুরু থেকেই সে চেষ্টা করেছে। মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় নিজে সুপারপাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তারের মতলবেই ভারত সার্ককে বিকলাঙ্গ করে রাখার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে।

সার্কের কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছে তাই বাংলাদেশ এর উচিত হবে অন্য কোনো শক্তিশালী আন্তজার্তিক জোট এর সাথে যুক্ত হওয়া যারা এই বিষয়ে সমর্থন দিবে।
ভারতের সাথে একছত্র কুটনৈতিক আধিপত্যে না থেকে বাংলাদেশ এর উচিত হবে বাংলাদেশ এর আশেপাশে যে রাষ্ট্র গুলো তাদের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা,যেমন:চীন, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া ইত্যাদির সাথে বাণিজ্য ও কৌশলগত চুক্তি করা।**আঞ্চলিক মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে এক বিকল্প কূটনৈতিক নকশা** তৈরি করতে হবে—যা হবে উম্মাহর সম্মিলিত শক্তির বাস্তবায়ন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদ:

আন্তর্জাতিক মঞ্চে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বিষয়ে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ায় এবং ইসলামোফোবিয়া ছড়ায়।এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গুলো বিভিন্ন দেশে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে।এবং কাশ্মীর দাঙ্গা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি ভঙ্গ করেছে বারবার।
তাই এই ব্যাপারে আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে,
বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান—যৌথ বিবৃতি দিয়ে হিন্দুত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া।
Muslim Ummah Strategic Forum, Ummah Legal Consortium, Islamic Human Rights Commission ইত্যাদির মাধ্যমে একত্রিত প্রচারণা।
AJ+, TRT World, Middle East Eye, Press TV ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম নির্যাতনের কণ্ঠস্বর হওয়া
Amnesty, Human Rights Watch, Genocide Watch-এর মাধ্যমে RSS-এর ঘৃণা ও সহিংসতা নিয়ে তথ্যচিত্র ও গবেষণা ছড়িয়ে দেওয়া।
এবং বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু নিয়ে তারা যে মিথ্যা উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং হুমকি দিয়ে থাকে এই ব্যাপারে আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে প্রতিবাদ করা।

ভবিষ্যৎ করণীয়-গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি

ভারত, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের এ সকল কর্মকান্ড গাযওয়াতুল হিন্দের পটভূমি তৈরী করছে। একদিন বাংলাদেশ-ভারত মুসলিম ও মুশরিকের লড়াই হবে। সুতরাং এখনই সেই লড়াইয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। (হিন্দ: ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ইত্যাদী)

عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر ضعيف الإسناد . سنن النسائي 3173 (تحقيق عبد الفتاح(

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমদের কে গাযওয়াতুল হিন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি এই যুদ্ধ পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার জান-মাল সর্বস্ব বিলিয় দিব। যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমি হবো শ্রেষ্ঠ শহীদ। আর গাযী হয়ে ফিরে আসলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তপ্রাপ্ত হবো। -সুনানে নাসায়ী **৩১৭৩**

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام، صحيح ، سنن النسائي 3175 (تحقيق عبد الفتاح(

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাম উম্মতের দুইটি দল জাহান্নাম থেকে মুক্ত। এক দল যারা গাযওয়াতুল হিন্দে শরীক হবে। অপর দল যারা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে থাকবে। -সুনানে নাসায়ী **৩১৭৫**

আল্লাহ তাআলা সুযোগ দান করলে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সুরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

অর্থ: তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু তথা তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না।

উপসংহার:

হিন্দুত্ববাদ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয় বরং এটি একটি তাগুতি কাফের মতবাদ—যা ইসলামের চিরশত্রু। এই মতবাদ মুসলমানদের ঈমান, আক্বীদা ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বহু বছর ধরে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আগ্রাসনের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যদি তার দ্বীন, তাওহীদ ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়, তবে এই আগ্রাসন সহজেই সফলতা লাভ করতে পারে।তাই এই বিষয়ে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে,কারণ ওরা ওদের সবকিছু নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে,আমরা যদি আমাদের প্রস্তুতি না নিয়ে থাকি দেখা যাবে আমাদের অবস্থা হায়দ্রাবাদ কিংবা আরেকটা কাশ্মীর এর মতো হবে।ওরা আমাদেরকে ঘর থেকে নিয়ে দলে দলে জবাই করবে,আমাদের মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করবে।তাই নিজেদেরকে সর্বাত্মক ভাবে প্রস্তুত করতে হবে এই আগ্রাসন মোকাবিলা করার জন্য।

মুসলিম উম্মাহ এক দেহ এবং এক আত্মা, যেখান একটি অংশ কষ্ট পেলে অন্য অংশ ও কষ্ট পাবে।তাই আমাদের সবাইকে সংঘবদ্ধ হয়ে এটার মোকাবিলা করতে হবে।

ইন শা আল্লাহ আমরাই জয়ী হবো।এই থিসিসের আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—বাতিল যতই চক্রান্ত করুক, হক কখনো মুছে যায় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "আমি হককে পাঠাই বাতিলের মুখোমুখি, অতঃপর তা বাতিলকে চূর্ণ করে দেয়। তখন তা মিলিয়ে যায়" (সূরা আল-আনবিয়া: ১৮)। সুতরাং হিন্দুবাদী আগ্রাসনের মোকাবিলায় আমাদের সংগ্রাম হতে হবে ঈমানভিত্তিক, দৃঢ়চেতা ও সুপরিকল্পিত; তবেই আমরা সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক গ্রন্থসমূহ:
১-”হিন্দুত্ববাদ” উপমহাদেশে মুসলিম বিরোধী
ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ উপাখ্যান
২-
https://spbm.org/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-
%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A
6%BC-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
৩-
https://m.dailyinqilab.com/article/462726/%E0%A6%89%E0%A6%97%E0%A7%8D
%E0%A6%B0-
%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A
6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%93-
%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A
6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7-
%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%93-
%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A
7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-
%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%বফ
৩-
https://www.prothomalo.com/bangladesh/vym68xq08d?fbclid=IwZXh0bgNhZW0
CMTEAAR7ZJf0Rblr770NaSSD3VofKjf5VNjeH1Mr5mxD1fboqLNbUgtK2s7jIBQyAyA
_aem_96ADKmZnDd_14Rrq25পজদক
৪-https://dailyinqilab.com/editorial/article/681758
৫-
https://alaponblog.com/post/7308/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7
%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%
E0%A6%BE%E0%A6%A6--%E0%A6%8F%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
%E0%A6%93-
%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9ফ
৬-https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/sagir42/29515522
৭-
https://weeklybangladeshusa.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6

%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-
%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A8/
৮-https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/282447
৯-https://www.jamaat-e-islami.org/news-details.php?category=5&news=23859
১০-https://ht-bangladesh.info/%E0%A6%B9%E0%A7%87-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0-
%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D/
১১-https://youtu.be/ZACAiLrliic?si=Q8o4qKZmaO4হফণকগ
১২-https://youtube.com/playlist?list=PLYS95Y-MtFm96DeSVzal5u8jQpRLZ4c5D&si=8Xi_lh2QsQasI1eE
১৩-https://youtube.com/playlist?list=PLMGgvYdxYkRJHGgNbXMxiMnh-4AsYiPUr&si=kXnS2nTEIakzItg0
১৪-
https://youtube.com/playlist?list=PLMGgvYdxYkRIsIrxkPTmdvu5D3PCgw3Ma&si=hYEyvVaYc6z5-2চী
১৫-https://youtu.be/3SxRgrYSOa8?si=XwiP2Ohnk2PA0h3দ
১৬-https://youtu.be/J7JUm8IXoBU?si=J1DT2mQk5t77ক্যজল
১৭-
https://protidinerbangladesh.com/opinion/122781/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-
%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%আফ